আলকাপ

আলকাপ

মহঃ নুরুল ইসলাম

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ □ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রস্তাবনা

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতির অন্যতম সমৃদ্ধ আঙ্গিক হল লোকনাট্য আর লোকনাট্যের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হল আলকাপ ও গম্ভীরা। আলকাপের উৎস লৌকিক জনজীবন থেকে, কোনো আরোপিত চিন্তা-চেতনা আলকাপের দেহে নেই। পরিবেশের লৌকিক সমাজ, হাটবাটের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচর্চা ও লোকসমাজের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ মানবিক সম্পর্ক আলকাপকে অনন্য লোকশিক্ষকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ করেছে। শ্রেণী সমাজের আশা-আকাঙক্ষা হতাশা অবিচার শোষণ আর্থিক দীনতা লাম্পট্য উদারতা সাধুতা এবং সর্বোপরি জনমানসের প্রতিবাদী ধ্যান-ধারণা আলকাপ লোকনাট্যকে এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক মর্যাদায় উন্নীত করেছে। সাধারণ মানুষ এই লোকনাট্যে যেমন সুস্থ বিনোদনের ব্যাপক খোরাক পেয়েছেন, তেমনি গ্রামীণ মানুষ লোকশিক্ষায় উদ্দীপিত হয়েছেন, পথ চলার ইন্ধন পেয়েছেন।

নানাবিধ পারিপার্শ্বিক কারণে, সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনে, মানুষের রুচিবোধের বিবর্তনে এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের অসুস্থ দাপটে আলকাপের মতো এক শক্তিশালী গ্রামীণ মাধ্যমের দৈন্যদশা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। আশার কথা, মুর্শিদাবাদের গুণী আলকাপ শিল্পীবৃন্দ এই বিকৃতির বিরুদ্ধে যৌথভাবে উদযোগ গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সফল হবেন এই কামনা জানাই। আলকাপের ইতিহাস ও সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে পাঠকবর্গ ওয়াকিবহাল হতে পারবেন এই সুলিখিত গ্রন্থপাঠে। গ্রন্থটি সরেজমিনে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে লেখা হয়েছে।

প্রদীপ ঘোষ
সচিব
লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

নিবেদন

মুর্শিদাবাদ-মালদা জেলার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহের এক জনপ্রিয় লোকনাট্য আলকাপ বা পঞ্চরস। সংশ্লিষ্ট এলাকায় জন্মসূত্রে ও আলকাপের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে আজীবন লালিত-পালিত হবার সূত্রে ছেলেবেলা থেকেই আলকাপ বা পঞ্চরসের রূপান্তর দেখার সুযোগ হয়েছে। তাকেই এই গ্রন্থে সুনির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই বিষয়ে ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও আলোচনা-সভায় নানা নিবন্ধ প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু গ্রন্থরূপে এই প্রথম প্রকাশ করতে পেরে নিজেকে গর্বিত বোধ করছি।

এই বিষয়ে পল্লব সেনগুপ্তের নির্দেশনায় ও আন্তরিক সান্নিধ্যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ph. D-র জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভ নিবেদন করেছিলাম, কিন্তু দীর্ঘ দশ বছর পর তা গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হওয়ায় অনেক নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণ এখানে সংযুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছি। শ্রীসেনগুপ্ত যদি আমাকে উৎসাহ প্রেরণা না জোগাতেন তাহলে হয়তো এই বিষয়ে নানা পত্রিকায় লেখা বা গবেষণা করার সুযোগ পেতাম না। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ভাষাহীন।

পাশাপাশি গড়িয়াহাটস্থিত ফোকলোর আকাদেমির পরম শ্রদ্ধেয়

শিক্ষকমণ্ডলী দিব্যজ্যোতি মজুমদার, সনৎ মিত্র, দুলাল চৌধুরী, গবেষণাকালীন ও গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ মতামত পরামর্শ দিয়ে আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রীমজুমদার যেদিন টেলিফোনের মাধ্যমে অভিসন্দর্ভটি প্রকাশের সংবাদ দেন সেদিন যে আমার কি আনন্দ হয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সচিব মাননীয় শ্রীপ্রদীপ ঘোষ 'আলকাপ' গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যাপারে নানাভাবে পরামর্শ, মতামত দান করে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

সর্বোপরি সুধী সমালোচক, পাঠকবৃন্দের নিকট সুচিন্তিত মতামত প্রদানের মাধ্যমে গ্রন্থটিকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য অনুরোধ রাখছি।

মহঃ নুরুল ইসলাম

বহু আত্মত্যাগ, ভালোবাসা ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে
লোকনাট্য আলকাপকে টিকিয়ে রাখা
অজস্র লোকশিল্পীদের উদ্দেশে

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

আলকাপের পরিচয়

আলকাপ মুর্শিদাবাদ ও সন্নিহিত জেলাসমূহের জনপ্রিয় লোকনাট্য। আলকাপের মূল এলাকা মুর্শিদাবাদ, মালদা ও তার সন্নিহিত বাংলাদেশের রাজশাহি, বিহারের সাহেবগঞ্জ, পাকুড় ও পশ্চিমবাংলার বীরভূম জেলার মধ্যে পরিব্যাপ্ত। আলকাপ গানে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মেরই দরিদ্র শ্রেণীর শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। আলকাপ কোন আনুষ্ঠানিক বা পূজা উৎসব ভিত্তিক লোকনাট্য নয়; বছরের যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হয়। তবে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস থেকে শুরু করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত আলকাপের আসর বসে বেশি। লোকনাট্যের প্রখ্যাত সমালোচক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য বলেন, "আলকাপের 'কাপ' অংশটি রঙ্গরসের কৌতুকের দ্যোতক।"[১] বিদগ্ধ সমালোচক হরিপদ চক্রবর্তী আলকাপের অর্থ প্রসঙ্গে বলেন — সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, দেশি সব ভাষাতেই 'আল' শব্দ পাওয়া যায় বিভিন্ন অর্থে। আরবি 'আল' মানে মস্তান, ফারসি অর্থ লাল রং, সীসা, মদ্য, বাংলা মানে হুল, কীলক, কণ্টক, বেড়া ইত্যাদি। 'কাপ' কথাটির অর্থ কৌতুককারী, ছদ্মবেশী, তামাসা, সঙ। 'আল' ও 'কাপ' দুটি মিলে সূক্ষ্ম তামাসা, ধারাল কৌতুক, রঙ্গ-ব্যঙ্গ অর্থ পাওয়া যায়।[২] ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে 'শিবের ভিক্ষাযাত্রা' অংশে 'কাপ' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়।

কেহ বলে ঐ এল শিববুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।।

এখানে রঙ্গ-ব্যঙ্গকারী অর্থে কাপ শব্দটি ব্যবহৃত। 'কাপ' শব্দটির উৎপত্তি কাপট্য থেকে (কাপট্য > কপট > কাপ), যার অর্থ ছদ্মবেশ বা কৌতুক।

প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য আলকাপের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "একপ্রকার গ্রামীণ নাট্যের নাম 'আলকাপ'। মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতেই তা সমধিক জনপ্রিয়। যদিও অনুষ্ঠানটি ধর্ম নিরপেক্ষ তথাপি মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকের কাছে তা বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। আলকাপ পূর্ণাঙ্গ নাটক নয়. তাকে গ্রাম্য জীবন চিত্র ভিত্তিক নাটকীয় নকসা বলা যেতে পারে।"[৩]

আলকাপের পরিচয় প্রসঙ্গে আরেকটি মূল্যবান অভিমত দেন মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা থানার অন্তর্গত চণ্ডীপুর, শ্রীমন্তপুরের আলকাপ দলের খলিফা শ্রীগোপাল চন্দ্র মণ্ডল। তাঁর মতে আলকাপ শব্দটি 'আলকাটা কাপ' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। আলকাটা কাপ শব্দের তিনি অর্থ করেন — আল মানে সধমা (জমির আল) আর আলকাটা কাপের অর্থ সীমাহীন হাসি তামাসা বা অসংযত রঙ্গ রসিকতা।

এরই বিপরীত একটি মত পাওয়া যায় মালদার ইংলিশ বাজারের রামকৃষ্ণপল্লীর প্রখ্যাত লোকশিল্পী বিশ্বনাথ পণ্ডিতের কাছে। তিনি আলকাপকে আলকাটা কাপের সংক্ষিপ্ত রূপ বলে মানতে নারাজ। তাঁর মতে আলকাপের কাপগুলি যেহেতু আগে ছিল ছোট আকৃতির তাই সীমায়িত অর্থে আলকাপ নামকরণ। তিনিও অবশ্য 'আল' অর্থে সীমাকেই বুঝিয়েছেন। গোপাল মণ্ডলের মন্তব্য উপস্থাপনা রীতির উপর আর বিশ্বনাথ পণ্ডিতের অভিমত আলকাপের দেহাবয়ব বা আকারের উপর ভিত্তি করে।

মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম, খড়গ্রাম, কান্দী. ভরতপুর, বীরভূম জেলার মুরারই, নলহাটি ইত্যাদি এলাকায় 'ছ্যাঁচড়া' জাতীয় লোকনাট্যও বলা হয়।

এর কারণ হিসাবে এলাকার লোকশিল্পীদের অভিমত হল, আলকাপ গানের মধ্যে 'ছ্যাঁচড়া' রান্নার মত পাঁচমিশেলী অনুষ্ঠান বা আঙ্গিক উপকরণ থাকে।[১]

উপরিউক্ত মতামতগুলি ছাড়াও আলকাপ শিল্পীদের মধ্যে সমধিক আলোচিত এবং বহু কাপের মধ্যে পরিস্ফুট আলকাপ শব্দের যে অর্থ পাওয়া যায় তা হল ব্যঙ্গমূলক বা বিদ্রূপাত্মক প্রতিবাদী অভিনয় রীতি। এখানে আল অর্থে 'হুল' এবং কাপ অর্থে 'কৌতুক' বা 'প্রহসন' বোঝানো হয়।[২]

আলকাপের প্রবাদ পুরুষ ওস্তাদ ঝাঁকসুর অভিমত 'কাপ' ব্যঙ্গ রসাত্মক নাটক আর 'আল' মানে হুল, মৌমাছির হুল। মধু খেতে হলে হুলের জ্বালাও সইতে হবে। তাই কেমন কাপ? না যার আল আছে। অর্থাৎ 'আলকাপ' গানে কেবলমাত্র লোককে হাসানোই হয় না, হাসানোর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ত্রুটি, বিচ্যুতি, অসঙ্গতিগুলিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-প্রতিবাদের আকারেও তুলে ধরা হয়, জনসাধারণকে সজাগ করে দেওয়া হয়। এই বক্তব্যের সত্যতা কয়েকখানি কাপের আলোচনাতেই ধরা পড়বে।

জমিদারি উচ্ছেদের কাপ

জমিদার তাঁর ছেলে সুরেশের জন্য সুন্দরী পাত্রী খুঁজতে তাঁর নায়েবকে নির্দেশ দেন। নায়েব বিভিন্ন জায়গায় খবরটি জানাবার জন্য ঢুলিকে ঢোল দিতে নির্দেশ দেন। নানা জায়গা থেকে পাত্রীর সন্ধান আসে। জমিদার পুত্রের শেষপর্যন্ত এক গরীব চাষির মেয়েকে পছন্দ হয়। কিন্তু কদাকার, কুৎসিত জমিদার পুত্রকে দেখে মেয়েটির পছন্দ হয় না। তার অপছন্দের কথা তার বাবাকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু জমিদারের চাপে পড়ে এবং ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবার ভয়ে মেয়েটির বাবা শেষ পর্যন্ত রাজি হয়। বিয়ের দিনে কিন্তু চাষি-কন্যা জমিদার পুত্রকে মালা দিতে গিয়ে পাশে বসা নায়েবের ছেলের গলায় মালা পরিয়ে দেয় এবং তাদের মধ্যেই বিয়ের কাজও সমাধা হয়ে যায়। ক্রুদ্ধ জমিদার নায়েব ও চাষির উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলে নায়েবের নেতৃত্বে প্রজারা বিদ্রোহ করে জমিদারকে জমিদারি থেকে উচ্ছেদ করে।[৫]

কাপটিতে জমিদারের স্বেচ্ছাচারিতা, শাস্তির ভয়, প্রজাদের উপর দমন-পীড়ন, জমিদার শ্রেণীর হিংস্র রূপকেই পরিস্ফুট করে। অত্যাচারী-স্বেচ্ছাচারী জমিদারকে জমিদারি থেকে উচ্ছেদ করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই ধরনের ঘটনার বাস্তবিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। বাস্তবে এই ঘটনা ঘটা হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু লোকশিল্পীরা সমাজের দরিদ্র ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। তাঁরা জমিদারের দ্বারা নানাভাবে নিপীড়িত, অত্যাচারিত হন, প্রত্যক্ষভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই, তাই তাঁদের প্রতিবাদী মন তাঁদের শিল্প কর্মের মধ্যে প্রতিবাদ জানিয়ে, প্রতিশোধ নিয়ে ইচ্ছাপূরণ ঘটিয়েছে। বহুল প্রচলিত 'নাককাটা রাজা ও টুনটুনি'-র গল্পটিও এই বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করে।

বক্কন মারা কাপ

গাঁয়ের মোড়ল দুঃখীরামের গোরুটাকে জমিতে ফসল খাবার অপরাধে হত্যা করে ফেলে। মনের দুঃখ চেপে রেখে দুঃখীরাম চামডাটাকে বিক্রি করে কিছু পয়সা পাবে ভেবে হাটে বিক্রি করতে যায়। কিন্তু চামড়াটা বিক্রি হয়নি। বাধ্য হয়ে বাডিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। রাস্তায় আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেলে মাঠের মাঝখানে এক বিরাট বটগাছ তলায় উঠে পড়ে এবং একটা ডালের সঙ্গে নিজেকে গামছায় বেঁধে বিশ্রাম নিতে থাকে। গভীর রাতে সেই গাছতলায় কয়েকজন চোর চুরি করে এনে গাছতলায় ভাগ করতে থাকে। সেই সময় হঠাৎ গোরুর চামড়ায় হাত লেগে শব্দ করে গাছের উপর থেকে পড়ে যায়। চোরেরা ভূত ভেবে প্রাণের দায়ে সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে যায়। দুঃখীরাম অতি ভোরে গাছ থেকে নেমে সব টাকা পয়সা নিয়ে বাড়ি চলে আসে। লোভী মোড়ল ঘটনাটা জানতে পেরে একই উপায়ে টাকা পাবার জন্য তার বাড়ির সবকটা গোরুকে কেটে তার চামড়া নিয়ে একইভাবে গাছে উঠে বসে। কিন্তু সে চোরদের হাতে পিটুনি খেয়ে ঘরে ফিরে আসে। তখন রাগে মোড়ল দুঃখীরামের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। দুঃখীরাম আবার ভাগ্যচক্রে ছাইয়ের বিনিময়ে বহু সোনা-

গয়না পেয়ে যায়। মোড়ল নিজের বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই বিক্রি করতে গেলে জনসাধারণের ধোলাই খেয়ে বাড়ি আসে। মোড়ল আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মোড়ল এবার দুঃখীরামকে নদীর জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলবে বলে বস্তায় পুরে নদীর দিকে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু রাস্তায় অন্য ঘটনা ঘটে। মোড়ল রাস্তায় বস্তা রেখে দূরে বনের মধ্যে জরুরি কাজ সমাধা করতে যায়। এদিকে দুঃখীরাম পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গোচারণরত অবিবাহিত গোয়ালাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে বস্তায় পুরে দেয়। মোড়ল দুঃখীরামের বদলে গোয়ালাকে জলে ফেলে দেয়। দুঃখীরাম গোয়ালার সমস্ত গোরু, বাড়ি নিয়ে চলে আসে। দুঃখীরামের গোরু পাওয়ার ঘটনায় মোড়ল ঈর্ষান্বিত হয়ে দুঃখীরামের পরামর্শে পাতালপুরী থেকে গোরু আনতে গিয়ে দুঃখীরাম কর্তৃক মোড়ল সাত ছেলেসহ জলে ডুবে মারা যায়।[৬]

'বক্কন মারা' কাপটিতে একটি প্রচলিত উপকথার সাদৃশ্য চোখে পড়ে। টুনটুনির বইয়ের বাঘ ও শিয়ালের গল্পের সঙ্গে মিল বিদ্যমান। কাপটিতে বুদ্ধির জোরে দরিদ্র দুঃখীরাম বিত্তবান মোড়লকে গোরু হত্যার শাস্তি দিয়েছে সবংশে নিধন করে। বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। এ ব্যাপারটা পুরোপুরিই অত্যাচারিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষের অপরাভূত মানসিকতার আত্মতৃপ্তি পাবার এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়েছে।

'রাজার চারটি প্রশ্নের কাপ'

এই কাপে রাজা চারটি প্রশ্ন দিয়ে ঘোষণা করেন যে, সঠিক উত্তরদাতা মোটা পুরস্কার পাবে আর না পারলে রাজার ইচ্ছামত শাস্তি পাবে। রাজার এক কর্মচারী ছিল খুবই লোভী। সে রাজার কাছে সঠিক উত্তর দিতে অক্ষম হয়। তার স্ত্রী ছিল দেখতে বেশ সুন্দরী। তার প্রতি রাজার গোপন মোহ ছিল। রাজা সুযোগ বুঝে তখন তার বৌয়ের তাঁর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কর্মচারী মহা-চিন্তায় পড়লেন। বৌকে একথা বলায় বৌ বহু চিন্তা করে রাজাকে জব্দ করার উপায় বের করেন। পরদিন রাজা এসেছেন

কর্মচারীর বাড়িতে। বৌ তার স্বামী অর্থাৎ রাজার কর্মচাবীকে একাই খেতে দিয়েছে। কর্মচারী তার পাত্রে কিছু উচ্ছিষ্ট খাবার রেখে উঠে যায় আর বৌ সেই খাবার খেতে দেন রাজাকে। রাজা এতে রেগে গেলে কর্মচারী বৌ বলে, ''রাজামশাই, আপনি আমার স্বামীর উচ্ছিষ্ট খাবার যদি খেতে না পারেন তবে আমাকে বিয়ে করবেন কি করে?'' রাজা ভীষণ বিপদে পড়েন। রাজা তখন আত্মসম্মান বাঁচাতে কর্মচারীকে শাস্তি দানে বিরত থাকেন এবং তাকে পুরস্কার দেন মোটা টাকা।[৭]

এই কাপেও দুর্বলের জয় ও সবলের পরাজয় ঘটেছে। বাস্তবে রাজার দ্বারা সকলেই কোন না কোন ভাবে অত্যাচারিত নিপীড়িত হয়। রাজার নিজের ইচ্ছাকে চরিতার্থতা করতে গিয়ে যে কোন কৌশল গ্রহণ করে — আলোচ্য কাপে রাজার এই চরিত্র ফুটে ওঠে। বাস্তবে রাজার ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা দুর্বল প্রজার পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু লোকশিল্পীরা রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তাঁদের কাপে কর্মচারী বৌয়ের মাধ্যমে রাজাকে 'আলি' বা কটাক্ষের জ্বালায় বিদ্ধ করেছেন।

ডোমনির কাপ

এক ডোমনি হাটে যায় কুলো বিক্রি করতে। সে বেশ সুন্দরী। এক ধনী সাউজি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ডোমনিকে দেখে রূপমুগ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ডোমনি তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু পরে সাউজির নানা প্রলোভনে পড়ে ডোমনি সাউজির সঙ্গে চলে যায়। অন্যদিকে ডোম ডোমনি ঘরে না ফেরায় খুঁজতে বের হয়। সন্ধান পেয়ে আসে সাউজির বাড়ি। দরজায় বার বার ডাক দেয়, কিন্তু দরজা না খোলায় পাড়া প্রতিবেশীদের নিয়ে এসে দরজা ভেঙে ঢুকে এবং সাউজিকে ধোলাই দিয়ে ডোমনিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।[৮]

এই কাপে বিত্তশালী বলবান সাউজির পরাজয় ঘটেছে সমাজের দরিদ্র নিপীড়িত শ্রেণীর সংঘশক্তির কাছে। পরস্ত্রীকে সুন্দরী দেখে তাকে রক্ষিতা করে রাখাব উদ্দেশ্যে নানা রকমের ছলনা প্রলোভনের আশ্রয় নেওয়া

সমাজের বিত্তশালী মানুষের কাছে নতুন ঘটনা নয়। এই বিত্তশালী মানুষের লোভ-লালসা চরিতার্থতা করার বিরুদ্ধে মানুষকে সংঘবদ্ধ করে প্রতিরোধের শিক্ষা দেন লোকশিল্পীরা।

'আলকাপ' গানে শুধু কাপের মধ্যে নয়, ছড়া গানের মধ্যেও সমাজের উঁচু তলার মানুষের বিরুদ্ধে নিচু তলার মানুষের ব্যথা-বেদনার কথা স্থান পায়। এমন একটি ছড়া গানেব অংশ বিশেষ উল্লেখ করছি।

দেশের নেতা গো
পল্লীবাসীর বুকের ব্যথা গেল না
সবাই পেল স্বাধীনতা আমরা কেন পেলাম না।
ভারত স্বাধীন আমরা স্বাধীন
কানে শুধু শুধু শুনতে পাই
দেশের নেতা আছে যারা তারাই তো মানুষ মারা।
সর্বদাই সে চেষ্টা করে আপন স্বার্থ লিয়্যা।
নেতারা তাই যুক্তি করে পল্লী ছেড়ে যায় শহরে।
পল্লীবাসীর ঘরে ঘরে ঘটল রে কি যন্ত্রণা
বাবুরা পাউডারেতে দন্ত মাজে মুখ মোছে তোয়লাতে
আমরা চোখের জল মুছি ছেঁড়া চটের থল্যাতে।[১]

ছড়াটিতে আমাদের দেশের স্বার্থপর নেতাদের প্রতি ধিক্কার জানানো হয়েছে। মানুষের বাসনা ছিল স্বাধীনতার পর তাদের দুঃখ-কষ্টের লাঘব হবে, কিন্তু তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি, বরং আরো কোন কোন ক্ষেত্রে খারাপ হয়েছে। সাধারণ মানুষের এই ব্যথা-বেদনাকেই শিল্পীরা তাঁদের ছড়ায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আকারে উপস্থাপন করেছেন। Anti establishment বা প্রচলিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে প্রতিবাদ ঘোষণা করেন। এভাবে আলকাপ শিল্পীরা সাধারণ মানুষের নানাবিধ সমস্যার কথা ছড়ার গানে কাপে তুলে ধরে কখনো প্রতীকী আবার কখনো প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদ মুখর হন। তাই আলকাপ হল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হাস্যরসাত্মক প্রহসন বা নক্সা।

উৎসপঞ্জি

১. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য : বাংলার লোকনাট্য সমীক্ষা, পৃ-৫৫৫

২. হরিপদ চক্রবর্তী : 'মধুপর্ণী', মালদহ সংখ্যা, ১৩৯২ পৃ-৭৬

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসংস্কৃতি, পৃ-১৩২

৪. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : মায়ামৃদঙ্গ (উপন্যাস) পৃ-১১

৫. সাক্ষাৎকার : খলিফা আবুল কাসেম, ব্রাহ্মণগ্রাম, সুজাপুর, মালদহ।

৬. শিল্পী নবেদ আলির (শেরশাহি, কালিয়াচক, মালদহ) কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৭. ঐ

৮. অশীতিপর অবসরপ্রাপ্ত আলকাপ খলিফা সাজিরুদ্দিনের (মুকুন্দপুর বাঁধের উপর, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ) কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৯. নিজামুদ্দিন খলিফাব (রহিমপুর নাকিটোলা, মানিকচক, মালদহ) কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলকাপের উৎস

বিদগ্ধ সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য আলকাপের উৎপত্তি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "গম্ভীরা গানে বিষয়-বৈচিত্র্য যাহাই থাকুক না কেন ইহাতে প্রধানত শিব দেবতাটি লক্ষ্য থাকে বলিয়া এদেশে মুসলমান ধর্মের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা কেবলমাত্র হিন্দু কৃষক সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল। মুসলমান সমাজে ইহা (গম্ভীবা) কালক্রমে একটি স্বতন্ত্র রূপ লাভ করিল, তাহা আলকাপ গান বলিয়া পরিচিত। ইহা শিব বিষয়ক গম্ভীরা গানেরই ইসলামী সংস্করণ মাত্র"।[১] আলকাপ গম্ভীরা গানের মুসলিম সংস্করণ নয়। কারণ আলকাপ গানে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। আলকাপের গানের শুরুতে আসর বন্দনায় শিব, দুর্গা, সরস্বতী, শ্যামা ইত্যাদি দেবদেবীর বন্দনা করা হয়। তাছাড়া আলকাপের স্রষ্টা বলে যিনি সর্বজনবিদিত তিনি হলেন অধুনা রাজশাহি শিবগঞ্জের মোনাকয়সার বোনাকানা বা বনমালী সরকার। সম্প্রীতির মেলবন্ধন 'আলকাপ' লোকনাট্য।

আলকাপের আসরে সরস্বতী বন্দনা ঃ

নম বীণাপাণি জ্ঞানদায়িনী
শ্বেত শতদল কমলবাসিনী

বীণা যন্ত্রধরা তুমি মা সপ্তসুরা
মুনির মনোহরা অজ্ঞান বিনাশিনী।
আমরা কজন মিলে নেমেছি আলকাপ দলে
স্থান দিও চরণতলে ওগো মা বীণাপাণি।

আবার মালদা জেলার আলকাপ শিল্পীদের কেউ কেউ মনে করেন 'বোলবাহি' থেকে আলকাপের উৎপত্তি, তাঁরা আলকাপের দ্বৈত সঙ্গীতের সঙ্গে খোট্টা ভাষায় রচিত 'বোলবাহি'-র দ্বৈতসঙ্গীতের সাদৃশ্য দেখান। বোলবাহির একমাত্র আঙ্গিক 'দ্বৈতসঙ্গীত' কিন্তু আলকাপে দ্বৈতসঙ্গীত ছাড়াও কাপ, ছড়া, বৈঠকি গান ইত্যাদি আঙ্গিক থাকে। সুতরাং আলকাপের উৎস 'বোলবাহি'ও নয়।

মালদহ-মুর্শিদাবাদ জেলার সংলগ্ন বিহারের পুর্ণিয়া, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় হিন্দি ভাষায় আলকাপের মত আঙ্গিক বিশিষ্ট 'রাজধারী' নামক এক ধরনের লোকনাট্য বর্তমান। রাজধারীর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে এককালের রাজধারী শিল্পী ও বর্তমানে আলকাপ শিল্পী শ্যামচন্দ্র মণ্ডলের অভিমত হল হিন্দীতে যা ছিল 'রাজধারী' বাংলায় তা হল 'আলকাপ'।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, একটা লোকনাট্যের সঙ্গে অন্য লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিকগত কিছু মিল অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু একটি থেকে যে অন্যটি সৃষ্ট তার জোরালো যুক্তি আলকাপের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

আলকাপের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আর যে অভিমত আলকাপ শিল্পীদের কাছে পাওয়া যায় তা হল, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যম হিসাবে আলকাপের উৎপত্তি। ব্রিটিশ সরকার গান-বাজনা সভা-সমিতি সব কিছু নিষিদ্ধ করলে গ্রামের শিল্পীরা বনের মধ্যে গিয়ে কেউ রাজা, কেউ প্রজা, কেউ জমিদার সেজে অভিনয় করত এবং কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলত আলকাপ করছি। আলকাপের নাম করে অভিনয়ের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের অত্যাচার, নিপীড়ন, দোষ-ত্রুটিগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করে তুলত। মালদা জেলার মানিকচক থানার রহিমপুর নিবাসী আলফাজ, অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার শিবগঞ্জ

মোনাকয়সার ভবতারণ সরকার, বোনাকানা প্রমুখ শিল্পী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা ইংরেজদের কুকীর্তি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্য একধরনের নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, তা পরবর্তীকালে 'আলকাপ' নামে খ্যাত হয়।[১]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈতালিক' উপন্যাসে দেখি আত্মগোপনকারী রাজদ্রোহী অতুল মজুমদার 'বংশী মাস্টার' নামে পরিচয় দিয়ে গানের মাধ্যমে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। উদাহরণ হিসাবে একটি গানের উল্লেখ করা যাক —

মহাজন রক্ত চোষা
জমিদার ফোঁস মনসা
দারোগা সে লাটের ছাওয়াল
মোদের হৈল কাল।
বাঁচার নামে বিষম জ্বালা,
পরাণ হৈল ঝালাপালা,
ওই তিনটি শালাকে মারি খেদাও
ঘুচুক এ জঞ্জাল।[২]

সুতরাং আলকাপ শিব বিষয়ক গম্ভীরা গানের মুসলিম সংস্করণ বা হিন্দিভাষায় অভিনীত রাজধারীর বাংলা সংস্করণ নয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক প্রহসন আলকাপ সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিবাদের মাধ্যম। সূচনাকালে আলকাপ পেশাদারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। শিল্পীরা অবসর সময়ে আলকাপ গান করতেন। বড়জোর রাহা খরচটুকু পেতেন। যেখানে গান হত সেই গ্রামবাসীরা নিজেরাই যৎসামান্য খরচ বহন করতেন। পরবর্তীকালে আলকাপ গান যখন ক্রমশ পেশাদারী ভূমিকা শুরু করল, অর্থ বিনিয়োগ, মালিকানার ভিত্তি তৈরি হল, ব্যবসা হিসাবে দেখা গেল তখন আলকাপেরও বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত পরিবর্তন শুরু হল। চিৎপুরের যাত্রাগান, সিনেমা-ভিডিওর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে জনসচেতনার বিষয়কে অবহেলা করে

হাল্কা চটুল বিষয় নিয়ে কাপ বা পালা তৈরি হতে লাগল। দর্শকদের ব্যবসায়িক দিক থেকে মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে হিন্দী বা বাংলা ছবির কুরুচিপূর্ণ গানের আশ্রয় গ্রহণ করল বেশ কিছু দল। ফলতঃ নিজস্ব রীতি 'আল' অর্থাৎ হুল, খোঁচা বা ব্যঙ্গের পরিমাণটা কমে গিয়ে হাল্কা রঙ্গ-রসিকতাই বৃদ্ধি পেল, অপসংস্কৃতির শিকার হল।

উৎসপঞ্জি

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য -- বাংলার লোকসংস্কৃতি, পৃ. - ৩২২

২. সাক্ষাৎকার ঃ মোজাফ্ফর হোসেন, সদস্য, রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বৈতালিক' উপন্যাস — রচনাবলী পৃ. — ৪৯১।

তৃতীয় অধ্যায়

আলকাপের বিকাশ, বিস্তার ও রূপান্তর

আলকাপের বিকাশের পর্যায়ের যে সমস্ত শিল্পীদের নাম শোনা যায় তাঁরা হলেন অবিভক্ত মালদা জেলার শিবগঞ্জ থানার মোনাকয়সা নিবাসী বনমালী সরকার ওরফে বোনাকানা, ভবতারণ সরকার, মালদার মানিকচক থানার রহিমপুর নিবাসী আলফাজ প্রমুখ। বোনাকানার জনপ্রিয়তা এত বেশি ছিল যে, পরবর্তীকালে প্রত্যেক শিল্পী-রসিক সমাজ তাঁকে আলকাপের স্রষ্টা বা আদিপুরুষ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ভারতী' পত্রিকায় ১৯৫৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় অবনীকুমার রায় মন্তব্য করেন যে, প্রথম আলকাপ রচনা করেন বোনাকানা। বনমালী সরকার ওরফে বোনাকানার জন্ম বা তাঁর আলকাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। বোনাকানাকে যাঁরা দেখেছেন বা বোনাকানার সঙ্গে গান করেছেন এমন কয়েকজনের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় বোনাকানার জন্ম হয়েছিল ১৮৭০ খ্রি. কাছাকাছি কোন এক সময়ে। মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানার সুন্দরপুরের বাসিন্দা প্রখ্যাত আলকাপ শিল্পী সঙাল করুণাকান্ত হাজরা বছর ১৫ আগে কালিয়াচকে বোনাকানার ৮০ বছর বয়স্কা মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং জানতে পারেন যে তাঁর পিতা বোনাকানা ৭০ বৎসর বয়স পর্যন্ত আলকাপ গানের সঙ্গে সরাসরি

যুক্ত ছিলেন। তাহলে অনুমান করা যায়, তিনি বিশ শতকের ৪০ দশক পর্যন্ত আলকাপ দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[১]

বিকাশের পর্যায়ের আলকাপের আঙ্গিক ছিল আসর বন্দনা, কাপ ও ছড়াগান। দ্বৈতসঙ্গীত ও বৈঠকি গান কাপেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময়ে দুই দলে পালা গান বা তর্জা গান হত। এই পর্যায়ের আলকাপ গানে ছোকরা ছাড়া অন্য কোন শিল্পী বিশেষ মেক-আপ নিতেন না। চরিত্রোপযোগী সাজপোশাকের বাহারও সেরকম ছিল না। শিল্পীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন অপেশাদার। পুরুষরাই নারী চরিত্র হিসাবে ছোকরার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। বাদ্য যন্ত্র হিসাবে হাঁড়ি কলসী ঝুড়ি প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। ফাঁকা মাঠে বা বাগানে গান হত। এই স্তরে ৬/৭ জন নিয়েই আলকাপ দল গঠন করা যেত।[১]

বিস্তার

আলকাপ গানের আচার অনুষ্ঠান পূজা-উৎসব রীতি-নীতি নিরপেক্ষ সার্বজনীন আবেদন সর্বস্ব উপস্থাপনভঙ্গি, কৌশল-আঙ্গিকে দর্শক সাধারণকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করতে শুরু করে। জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন দলের সৃষ্টি হয়। এই বিস্তৃতি বা বিস্তার ঘটতে শুরু করে ৫০-৬০ এর দশক থেকে। এই সময়ে অধিকাংশ অঞ্চলে বছরে অন্তত একবার বেশ কয়েকদিনের জন্য আলকাপের আসর বসত। সেই সময় আলকাপই এলাকার প্রধান নাট্যরস সঙ্গীতরস বিনোদনের মাধ্যম হয়ে ওঠে।[২]

বোনাকানাব অন্যতম শিষ্য মুর্শিদাবাদ জেলার সমসেরগঞ্জ থানার হাঁসুপুর গ্রাম নিবাসী কবিয়াল বসন্ত সরকারের সাহচর্যে জঙ্গীপুরের ধনপত নগরের ধনঞ্জয় সরকার ওরফে ঝাঁকসু আলকাপ দল গঠন করেন। ঝাঁকসুর গুরু ছিলেন ধনপত নগরেরই নিতাই মণ্ডল। নিতাই মণ্ডলেব দল থেকে তিনটি দলের উৎপত্তি হয়। ঝাঁকসু ছাড়া অন্য দুটি দল হল বদ্দিনাথ মাস্টার ও অক্ষয় মণ্ডলের। ঝাঁকসুর সময়ে বা তার পরে মুর্শিদাবাদ ও সন্নিহিত জেলাগুলিতে প্রায় ৫০টি আলকাপ দলের সৃষ্টি হয়।

এই সময়ে আলকাপে বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে নামকরণের বিবর্তনে। আলকাপের নতুন নামকরণ হয় আলকাপ পঞ্চরস। আলকাপ শিল্পীদের অধিকাংশেরই অভিমত ঝাঁকসুই আলকাপের সঙ্গে 'পঞ্চরস' কথাটি যুক্ত করেন। আলকাপ পঞ্চরসের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর পঞ্চরসতত্ত্বের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে পঞ্চরস বলতে পাঁচমিশেলি আঙ্গিককে বোঝানো হয়েছে। আলকাপের বিকাশেব পর্বে আঙ্গিক ছিল প্রধানত তিনটি — বন্দনা, ছড়া ও কাপ। কিন্তু বিস্তার পর্বে যুক্ত হল আরো দুটি আঙ্গিক, তা হল — বৈঠকি গান ও যাত্রাপালা। এই পাঁচটি আঙ্গিক নিয়েই আলকাপের নামকরণ হয় — আলকাপ পঞ্চরস।

বিস্তার পর্বে উপকরণের দিক দিয়ে তবলা, বায়া, ফলোট, কনেট, হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের আগমন ঘটে। পালার মধ্যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয় আসতে থাকায় রাজা, মন্ত্রী, রাজপুত্র, কোটাল প্রভৃতি চরিত্রের উপযোগী সাজপোশাকের প্রচলন শুরু হয়। সামাজিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও চরিত্র উপযোগীর সাজপোশাক ব্যবহার দেখা যায়। আগে যেখানে কেবলমাত্র নারীচরিত্রের রূপদানকারী পুরুষ ছোকরারাই মেক-আপ নিতেন, এই পর্যায়ে প্রায় সকল চরিত্রেই মেক-আপ নেওয়া এক রীতি হয়ে দাঁড়ায়। আগে আলকাপের আসরে প্রবেশ-প্রস্থানের জন্য রাস্তা থাকত না, অভিনয় শেষ হলে শিল্পী দোহারকি হিসাবে বাজনদারদের পাশেই বসে পড়তেন। কিন্তু এই পর্বে দর্শকদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা থাকা শুরু হয়। গ্রিন রুমেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আলকাপ গান যেখানে মাঠে বা বাগানে হত সেখানে ক্রমশ লোকালয়ের দিকে আসতে শুরু করে। কোথাও কোথাও টিকিট কেটে 'আলকাপ পঞ্চরসের' অভিনয় শুরু হয়। আগে যেখানে শিল্পীরা অ্যামেচার বা অপেশাদার ছিলেন সেখানে শিল্পীদের মধ্যে ক্রমশ পেশাদারি রূপ বৃদ্ধি পায়। আগে কাপগুলি ছিল বড়, ৩/৪ ঘণ্টা সময় লাগত। কিন্তু পালার আগমন ঘটায় 'কাপ' অংশটি ক্রমশ ছোট হয়ে যায়।

রূপান্তর

বিকাশ পর্যায়ের আলকাপ বিস্তৃতির পর্বে এসে 'আলকাপ পঞ্চরস' নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে 'আলকাপ পঞ্চরস' অপেরা বা কেবলমাত্র পঞ্চরস অপেরা নামে পরিচিত হচ্ছে। এখন কিছু কিছু দল চিৎপুরী যাত্রা দলের মত নামের সঙ্গে কেবল 'অপেরা' কথাটি ব্যবহার করেন। যেমন 'মহাতাব অপেরা', 'জয়রাণী অপেরা', 'বাবলু অপেরা' ইত্যাদি। তবে এরা সংখ্যায় এখনও কম।

এই পর্বের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আগে যেখানে নারীদের ভূমিকায় পুরুষ ছোকরারা অবতীর্ণ হতেন সেখানে নারীচরিত্রে নারীদের আগমন ঘটল। আগে সারা রাত ধরে আসর জমে থাকত, এমনকি অনেক বেলা পর্যন্ত দর্শকদের ভিড় কমত না। সেখানে পরবর্তীকালে ৫/৬ ঘণ্টার মধ্যে সমাপ্ত হয়ে যায়। কোন কোন দল আবার চিৎপুরী যাত্রার ঢঙে ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যে আসর শেষ করে দেন। পূর্বের কাপের সঙ্গে কপ্যার সামান্য ভূমিকাটি ছাড়া তার মিল পাওয়া কঠিন। 'ছড়াগান' বহু দলেই হয় না। কোন কোন দল আবার মূকাভিনয় জাতীয় আঙ্গিক হিসাবে ব্যবহার করেন। গ্রাম্য কথাবার্তা বা আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগের দ্বাবা সংশ্লিষ্ট এলাকার দর্শক সাধারণের যে নৈকট্য গড়ে উঠত তার জায়গায় কেন্দ্রীয় ভাষার আগমন ঘটে। তক্তাপোষ দিয়ে বা কাঠ দিয়ে উঁচু মঞ্চ তৈরি হল। বেশ কয়েকটি দল মাইক, আলোব ব্যবহারও শুরু করেছেন। সর্বোপরি আলকাপ দলের কোন দিন পোস্টার দেখা যেত না, ঢুলিকে দিয়ে হাটে বা গ্রামাঞ্চলে ঢোল পেটাই করে খবর দিয়ে দেওয়া হত আলকাপের আসরে, কিন্তু বর্তমানে আলকাপ বা পঞ্চরস অপেরার পোস্টার মারা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি বা মাধ্যমকে প্রচার হিসাবে দলগুলি ব্যবহার করছে।

রূপান্তরের কারণ

আলকাপ থেকে আলকাপ পঞ্চরস, তারপর আলকাপ পঞ্চরস অপেরা, তা থেকে আবার পঞ্চরস অপেরা হবার বা আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের আর্থ-সামাজিক কারণ বিদ্যমান।

আলকাপের দল মূলতঃ ছড়িয়ে আছে জঙ্গীপুর মহকুমার নানা এলা[illegible] মালদার দক্ষিণভাগে, বিহারের সীমান্তবর্তী সাহেবগঞ্জ পাকুড় জেলার বাংলা ভাষাভাষী এলাকায়। অন্য এলাকাতেও কিছু কিছু দল আছে। এই এলাকায় মানুষের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলকাপের বিবর্তন রূপান্তর ঘটেছে। আগে মানুষের মূল অর্থনীতি জীবন-জীবিকা ছিল কৃষি নির্ভর। ষাটের দশক পর্যন্ত মোটামুটি একই ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু একদিকে গঙ্গার ভাঙন অন্যদিকে কলকাতা বন্দরকে বাঁচাবার জন্য ফরাক্কা থেকে জঙ্গীপুর পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে ফিডার ক্যানাল কাটা হয়েছে! তারপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বসতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইভাবে কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, কৃষি নির্ভর জীবন-যাত্রা অবসর বিনোদন বিনষ্ট হয়ে গেছে। অন্যদিকে এই সকল অঞ্চলে অল্প পয়সায় মজুর পাবার জন্য গড়ে উঠেছে বিড়ি শিল্প। বর্তমানে এখানকার ৯০ শতাংশের উপর লোক বিড়ি শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। পূর্বে কৃষি নির্ভর জীবনযাত্রায় খরিফ শস্য বা রবি শস্য ঘরে চলে আসার পর বা কৃষিকাজের অবসর সময়ে মানুষের যে পূর্ণ অবকাশ থাকত সেই পূর্ণ অবকাশ বিড়ি শিল্পে নেই। এক হাজার বিড়ি বেঁধে বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েও মাত্র ৩০ টাকা পাওয়া যায়, সময় লাগে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা, পরিশ্রম করতে হয় প্রতিদিন, না হলে হাঁড়ি চড়ে না। ফলে সারাদিনের পরিশ্রমের পর আগের মত সারা রাত ধরে গান শোনা বিড়ি শ্রমিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। দর্শকদের সময়ের কথা বিবেচনা করে আলকাপের আঙ্গিকগুলিকে ছোট করে ফেলতে হয়েছে। আবার কোন কোন দল ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যে আসর বন্দনার পরই যাত্রাপালা শুরু করে দিয়ে আসর শেষ করে দিচ্ছে।

এলাকায় ৬০-এর দশক পর্যন্ত জঙ্গীপুর থেকে মালদা পর্যন্ত আলকাপ অধ্যুষিত এলাকায় সিনেমা হলের সংখ্যা ৫/৬টি মাত্র ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভিডিওর যুগে এই এলাকায় কয়েক শত ভিডিও হল চলছে, তিনটি শো

হচ্ছে প্রতিদিন। ফলে রসতৃপ্তি বা অবসর বিনোদনের বিকল্প মাধ্যম অতি সুলভ ও অল্প সময়ে হয়ে যাবার ফলে মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে আলকাপের আসরে বসে থাকছে না। ফলে দর্শকের বা শ্রোতার কথা ভেবে তারা কাপ বা ছড়া গানকে প্রায় বিদায় দিয়েছে।

৩০/৪০ বছর আগে দেখা যেত এলাকায় ক্লাবের ছেলেরা নিজেরা চাঁদা তুলে বা বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে বছরে একবার দুবার যাত্রা থিয়েটার করত। আর বাকিটা অবকাশ বিনোদনের মাধ্যম ছিল এলাকায় আলকাপ গান। কিন্তু বর্তমানে কলকাতার যাত্রাদল নিয়ে এলাকায় প্রত্যেক মাসেই কয়েক দিন ধরে যাত্রার আসর বসছে। তাদের অনুকরণ করেও এলাকার আলকাপ বা পঞ্চরসের দলগুলিও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে পুরানো পঞ্চরসের আঙ্গিক ছেড়ে কেবল পালাগান আঁকড়ে ধরছে, বিকৃত হচ্ছে তার বিষয়বস্তু।

আগের তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বা সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেযে হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। রুচিবোধও দিন দিন বদলাচ্ছে। ফলে আলকাপের আঙ্গিক-বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটছে।

আগে বেশিরভাগ আলকাপ গানের আসর বসত জুয়াড়িদের পৃষ্ঠপোষকতায়। তারা জুয়ার মাধ্যমে টাকা তুলে আসরের খরচ মেটাতেন। টিকিটের প্রচলন খুব একটা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে টিকিট প্রথা চালু হবার ফলে বেশি করে শ্রোতাকে আকৃষ্ট করার জন্য নানা কলাকৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে।

বেকারত্বের করাল গ্রাস সর্বত্র। আগে আলকাপ দলের অধিকাংশ শিল্পীই ছিলেন নিরক্ষর বা সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন বা বড়জোর চতুর্থমান। কিন্তু আলকাপ দল পেশাদারি পঞ্চরস অপেরায় পরিণত হওয়ায় শিক্ষিত বেকার যুবকরাও আলকাপকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে পারছে। ফলে আলকাপে রুচিরও পবিবর্তন ঘটছে।

আলকাপের দলে আগে শিল্পীরা প্রায় সকলেই স্থানীয় ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আলকাপ পেশাদারি দল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ফলে দূরের জেলা থেকেও শিল্পীরা আসছেন। সেটাকে জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। এমনও দেখা যায় ২/৪ জন ছাড়া কোন কোন দলে সকলেই বাইরের এলাকার শিল্পী। ফলে আলকাপ গানে সংলাপ বা ছড়াগানে যে স্থানীয় কথ্যভাষার প্রচলন ছিল তা আর থাকছে না। বাইরের শিল্পীদের কেন্দ্রীয় ভাষায় সংলাপ প্রয়োগ করতে হচ্ছে। তাতে দর্শকদের সঙ্গে ভাষার নৈকট্য কমছে, কৃত্রিমতা বাড়ছে।

আগে আলকাপের বেশিরভাগ আসর বসত লোকালয় থেকে দূরে মাঠে বা বাগানে। সেখানে মেয়েদের শ্রোতা বা শিল্পী হিসাবে প্রায়ই দেখা যেত না। নিরাপত্তার একটা বড় প্রশ্ন ছিল। সেইসঙ্গে বড় বাধা ছিল সামাজিক রীতি বা অনুশাসন। কিন্তু আলকাপ ক্রমশ লোকালয়ের ভিতরে আসতে থাকায় এবং শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজভাবনার পরিবর্তনের ফলে নারী চরিত্রে রূপদান করছে নারী শিল্পী, এখন ছোকরাদের আর প্রয়োজন হচ্ছে না। আসরের অর্ধেক অংশ জুড়ে থাকছে মহিলামহল। ফলে রুচিবও পরিবর্তন ঘটছে।

বর্তমানে অধিকাংশ দলই ছড়াগানের আঙ্গিককে একেবারে বাদ দিয়েছে। সময়ের সঙ্গে এর আরেকটি বড় কারণ অধিকাংশ দলে বর্তমানে ছড়াদার মাস্টারের অনুপস্থিতি। তাৎক্ষণিকভাবে ছড়া তৈরি করে আসরে উপস্থাপন করার শিল্পীর বড়ই অভাব। ফলে বাধ্যতামূলকভাবে ছড়াগান আর হচ্ছে না, কাব্যরস অতৃপ্ত থেকে যাচ্ছে।

উৎসপঞ্জি

১. সাক্ষাৎকার ঃ প্রবীণ শিল্পী আনেসুর রহমান, লাহাড়িয়া, বল্লালপুর, ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

২. সাক্ষাৎকার ঃ ওস্তাদ ফুলচাঁদ সরকার, গোপীনাথপুর, চাঁদপুর, পাকুড়, বিহার।

চতুর্থ অধ্যায়

আলকাপের শিল্পীসমাজ

আলকাপ দল ওস্তাদ বা ছড়াদার, ছোকরা, কপ্যা বা সঙাল, সাধারণ অভিনেতা, বাজনদার, দোহারকি ইত্যাদি নানা ধরনের শিল্পীর সমন্বয়ে গঠিত।

ছড়াদার বা মাস্টার

আলকাপে যিনি ছড়া গান পরিবেশন করেন, কাপ, পালা ইত্যাদি রচনা করেন তাকেই ছড়াদার বা মাস্টার বলা হয়। আবার কখনও তাঁকে বলা হয় ওস্তাদ বা খলিফা। দলের সুনাম বহুলাংশে তাঁর প্রতিভার উপর নির্ভর করে। তাই সাধারণত তাঁর নাম অনুসারেই দলের নামকরণ হত। যখন দুই দলের মধ্যে পাল্লা বা প্রতিযোগিতামূলক গান হত তখন মাস্টার বা খলিফাকেই দলের কাণ্ডারী হিসেবে আসরে অবতীর্ণ হতে হত। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ছড়া তৈরি করে অন্যদলের শিল্পীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কটাক্ষে বিদ্ধ করতেন। একে আলকাপের পরিভাষায় বলা হত 'ঠ্যাসমারা'। এক দলের খলিফার সঙ্গে অন্য দলের খলিফার ছড়া গানের মধ্য দিয়ে যে বাকবিতণ্ডা চলে তাকে বলা হত বোলকাটাকাটি। বর্তমানে আলকাপের সময়সীমা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং দর্শক শিল্পীদের মধ্যে পালার প্রতি বেশি আগ্রহ সৃষ্টির ফলে প্রায় প্রতিটি দলেই ছড়াদার মাস্টারের ভূমিকা

লুপ্ত হতে চলেছে। তাছাড়া বর্তমানে আলকাপ দলের পেশাদারি সাফল্য বৃদ্ধির ফলে বিত্তবান মানুষেরা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে দল তৈরি করছেন, তাদেরই এখন খলিফা বলা হচ্ছে। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশেরই পূর্বের খলিফাদের মত ছড়া সৃষ্টির প্রতিভা না থাকায় তাঁরা সেই দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হয়ে পড়ছেন। বিখ্যাত ছড়াদার বা মাস্টাররা হলেন ঝাঁকসু, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সুবেদ আলি, সুবল কানা, ফুলচাঁদ, শ্যামচাঁদ প্রমুখ।

কপ্যা

আলকাপ গানের মধ্যে 'কাপ' অংশে যিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন তাঁকে বলা হয় 'কপ্যা', আবার সঙ করেন বলে তাঁকে 'সঙাল' বা 'সঙদার'ও বলা হয়। মালদা জেলায় বহু জায়গায় কপ্যাকে বলা হয় 'লাব্বাড়'। 'লাব্বাড়' কথাটির 'খুট্টা' ভাষায় অর্থ হল ঠাট্টাকারী বা কৌতুককারী। কপ্যা দৈহিক অঙ্গভঙ্গি, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ, নিজস্ব ভঙ্গিতে গান প্রভৃতির মাধ্যমে দর্শক সাধারণকে হাসিয়ে থাকেন। কপ্যার উপস্থিত বুদ্ধি, রসবোধ, কথা বলার কৌশল প্রভৃতি ক্ষমতার উপরই কাপের গুণমান নির্ভর করে। কপ্যা হিসাবে বোনাকানার বেশ সুনাম আজও ছড়িয়ে রয়েছে। অন্যান্য প্রতিভাবান কপ্যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন রাজমহলের কলিমুদ্দিন, সুজাপুরের দানেশ, ঝাঁকসুর দলের ফজর, ভগবানগোলার সুন্দরপুরের করুণাকান্ত হাজরা প্রমুখ।

ছোকরা

আলকাপ গানে নারীবেশীপুরুষ অভিনেতাদের বলা হয় ছোকরা। এঁরা আবার নাচেন বলে নাচিয়াও বলা হয়। আসর বন্দনার পরে যে আঙ্গিকটি সাধারণত আসরস্থ হয় তাকে বলা হয় বৈঠকি গান বা খেমটা গান। এই অংশে ছোকরাদের একক বা দলগতভাবে নাচ গান থাকে। এই খেমটা অংশে কেবল ছোকরারাই অংশগ্রহণ করেন বলে তাঁদের খেমটি বলেও অভিহিত করা হয়। মুখাকৃতি সুন্দর, দেহের গঠন পাতলা বা মাঝারি, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর প্রভৃতি নানারকম বৈশিষ্ট্য দেখে ওস্তাদ বা খলিফা কোন

ছেলেকে কিশোর বয়স থেকেই তালিম বা প্রশিক্ষণ দেন। তাঁদের মেয়েদের চলন বলন সব কিছু রপ্ত করতে হয়। কোমর হেলিয়ে দুলিয়ে চলা, কথায় কথায় নাক সিঁটকানো, মুখ ভ্যাংচানো, টানা সুরে কথা বলা, কোমরে আঁচল জড়িয়ে হাত থাবড়ি দিয়ে ঝগড়া করার ভাবভঙ্গি, প্লুতস্বরে কান্না সব কিছুই আয়ত্ত্ব করতে হয়। এভাবে অনুশীলন করতে করতে তাঁর বদলে যায় চেহারা এমনকি মানসিকতাও, নিজেকে নারী হিসাবে ভাবতেও শুরু করেন। তাঁদের মাথায় লম্বা চুল থাকে, গোঁফ সর্বদা পরিষ্কার থাকে। ছোকরা বয়স সম্পর্কে ওস্তাদ ঝাঁকসু বলতেন —

কম বারো উপরে বিশ
তাতে একটু উনিশ-বিশ।

এই বয়সের সীমা সম্পর্কে ঝাঁকসুর অভিমত-এ যেন কাঠ খড় মাটি দিয়ে প্রতিমা গড়ে রঙ মাখিয়ে চোখে কাজল এঁকে সাজ পরিয়ে পূজা করা। মনের ভেতর আছে এক মোহিনী নটী। তাকে পুরুষের শরীরে রূপ দিই। মাটি নবম না হলে যেমন প্রতিমা গড়া যায় না, তেমনি যে বয়সে দেহ কোমল থাকে সেই বয়স না হলে চলে না।[১]

ছোকরার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেছেন— ''যারা পুরুষ তবু পুরুষ নয়, নারী — তবু নারী নয়। যদিবা পুরুষ, সে পুরুষ স্মৃতির পুরুষ পরোক্ষ। যদি বা নারী — সে নারী অধরা নারী প্রত্যক্ষ কিন্তু বিভ্রম। দেহে কণ্ঠে মনে একান্ত কিন্নর।[২]

কেউ কেউ মনে করেন এটা যেন কৃষ্ণ ভজনার জন্য নিজেদের প্রেয়সী কল্পনা করে চলনে বলনে পোশাক পরিচ্ছদে নারী হয়ে ওঠার সাধনার মত। সাজ-পোশাক পরিধান করে রূপসজ্জা করে তাঁরা যখন আসরে নামেন তাঁদের তখন মেয়েদের সঙ্গে পৃথক করা সত্যিই দুষ্কর হয়ে ওঠে। 'কিন্নরবেশী' ছোকরার প্রতি পুরুষের প্রেম একনিষ্ঠ প্রেমিকের প্রেমকেও হার মানায়। ছোকরা আলকাপ দলের অন্যতম স্তম্ভ. ওস্তাদ ঝাঁকসু বলতেন, রাতেব শোভা যেমন চাঁদ তেমনি আলকাপ দলের শোভা ছোকরা। যে

ছোকরাকে মোহিনী মূর্তি দান করতে ওস্তাদ ও ছোকরার এত সাধনা তাঁকেও কিন্তু প্রতিমার মত বিসর্জন দিতে হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন ভিতরের পুরুষ প্রকৃতিকে আর চাপা রাখা যায় না, গলা কর্কশ হয়ে ওঠে, চেহারার লাবণ্য ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায়, তখন চুল কেটে প্রতিভাবলে হয় সঙাল বা ছড়াদার আর না হয় সাধারণ অভিনেতা হিসাবে দলে থাকতে হয়। বিখ্যাত ছোকরাদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়, উপেন, শান্তি, মহেন্দ্র, ষষ্ঠ, মাহাতাব, ফুলচাঁদ, শ্যামচাঁদ, বাবলু প্রমুখের নাম করা যায়। বর্তমানে প্রায় সব দলেই ছোকরাদের স্থান গ্রহণ করেছে মহিলা শিল্পীরা।

আলকাপের অন্যান্য শিল্পী

ওস্তাদ, কপ্যা, ছোকরা ছাড়া আলকাপ দলের অন্যান্য শিল্পীরা হলেন বাজনাদার, দোহারকি ও সাধারণ অভিনেতা। বাজনাদারদের আলকাপ দলে কাজ কেবল বাজনা বাজানই নয়, প্রয়োজনে তাঁরা অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেন বা দোহারকির ভূমিকা পালন করেন। মূল গায়কের ধূয়া অংশকে যারা গাহেন তাদের বলা হয় দোহারকি। আসরে যাঁরাই বসে থাকেন, তাঁরাই এই ভূমিকা পালন করে থাকেন। সাধারণ অভিনেতাদের কাজ হল অভিনয় করা এবং আসরে বসে থাকাকালীন সময়ে দোহারকি হিসাবে অংশগ্রহণ করা।

শিল্পীদের আর্থসামাজিক পরিচয়

আলকাপ গানের লোকশিল্পীদের মধ্যে অধিকাংশই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল সম্প্রদায়ের হিন্দু-মুসলমান। আলকাপ দলে আজও বিরাট অংশের শিল্পীরা হলেন চাঁই মণ্ডল এবং রবিদাস সম্প্রদায়ের। আলকাপের প্রবাদ পুরুষ ঝাঁকসু, ফুলচাঁদ, গোপাল, বাবলু, শ্যামচাঁদ এরা সকলেই এই সম্প্রদায়ের! প্রায় ২০০ জন শিল্পীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম। তার মধ্যে ৯৮ জনই হলেন এই দুই সম্প্রদায়ের শিল্পী। অন্যান্যরা হলেন রাজবংশী, বাগদী, মাহিষ্য সম্প্রদায়ের। ধর্মগত দিক দিয়ে প্রায় ৩৫% শিল্পীরা হলেন দরিদ্র মুসলিম পরিবারের।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত বিচারে আলকাপ শিল্পীদের অধিকাংশই নিরক্ষর বা সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। যে শিল্পীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল তাঁদের ৩০% একেবারে নিরক্ষর, ২৬% কেবল নাম সই করতে পারেন, চতুর্থমান পর্যন্ত ২০%, ৫ম থেকে অষ্টম মান ১৫%। তবে বর্তমানে বেকারত্বের চাপে পড়ে পেশা হিসাবে আলকাপ দলে কিছু কিছু শিক্ষিত শিল্পী আসছেন।

আলকাপ শিল্পীদের ভূমি-সম্পদ নিতান্তই কম। অধিকাংশেরই বাস্তুভিটাটুকু ছাড়া কিছুই নেই। আবার অনেকেই থাকেন সরকারি কলোনীতে। আলকাপ দলের বেশ কিছু শিল্পী বর্গাদার চাষী। প্রান্তিক চাষী বা তার ঊর্ধ্বের জমির মালিক আলকাপ দলে নেই বললেই চলে। আলকাপের আসর সবসময় থাকেনা। অন্য সময়ে তাঁদের কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। ক্ষেতমজুরের কাজ করেন প্রায় ৩০%, মাছ ধরেন ১০%, বিড়ি শ্রমিক ১৫%, বর্ষাকালে মনসা গান করেন ১২%, ফেরিওয়ালা ১৪%, চর্মশিল্পী ৬%, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে বাজনাদারের কাজ করেন ৯%, বাকিরা হলেন ৪%।

আসর চলার সময়েও আলকাপ শিল্পীদের অবস্থা ভাল নয়। রাত পিছু পান গড়ে ৩০ থেকে ৪০ টাকা। আবার তালিম চলাকালীন সময়ে খোরাকিটুকু পান। সাতদিন গান করে একদিনের টাকা পাওয়া যায় না। সেই টাকাটা মালিক উপভোগ করেন।

এত দৈন্য-দুর্দশা সত্ত্বেও আলকাপ দলের বহু শিল্পী নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতার দ্বারা আলকাপ গানকে জনপ্রিয় করে চলেছেন এবং বহু বিবর্তনের মধ্যে সাধ্যমত তার ঐতিহ্যকে ধরে রাখার কাজে ব্রতী আছেন। শক্তিশালী ব্যবসায়িক মাধ্যমের বিরুদ্ধে লড়াই করে কতদিন টিকে থাকবেন তার বিচার করবে ভবিষ্যৎকাল।

উৎসপঞ্জি

১. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ঃ 'দেশ' পত্রিকা, ২১ আগস্ট, ১৯৮২

২ ঐ ঃ 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাস পৃঃ ১২।

পঞ্চম অধ্যায়

আলকাপের আঙ্গিক

সূচনা বা বিকাশ পর্বে আলকাপের আঙ্গিক ছিল আসর বন্দনা, ছড়া ও কাপ। পরবর্তীকালে বিস্তারপর্বে আলকাপে আসর বন্দনা, ছড়া ও কাপের সঙ্গে বৈঠকি গান ও পালা সংযুক্ত হয় এবং মোট পাঁচটি আঙ্গিক নিয়ে নামকরণ করা হয় আলকাপ পঞ্চরস। আবার কখনো দেখা গেছে শেষ আঙ্গিক যাত্রাপালা শেষ হয়ে যাবার পরও দর্শকদের আগ্রহ দেখে ডুয়েট বা দ্বৈতগীতি উপস্থাপন করা হয়েছে। অবশ্য কাপের মধ্যেও দ্বৈতগীতি থাকে। বছর পনের থেকে আলকাপ গানে 'মূকাভিনয়' নামে আরেকটি নতুন আঙ্গিক প্রয়োগ করতে দেখা যাচ্ছে। এটাকে আলকাপ শিল্পীরা টেলার বলে থাকেন। এটা বহুক্ষেত্রেই আসর বন্দনার পরেই উপস্থাপন কবা হয়।

আসর বন্দনা

শুরুতে যন্ত্র-সঙ্গীত হয়ে যাওয়ার পর আলকাপ দলের নাচিয়ে ছোকরারা সকলেই সারিবদ্ধভাবে আসেন আসরে। তাঁরা যন্ত্রবাদকদের দিকে মুখ করে দুটি বা তিনটি লাইন করে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনি দেন —

জয় জয় মা বাকবাদিনী কি জয়।
জয় জয় ওস্তাদ তানসেনকি জয়।

জয় জয় ওস্তাদ বোনাকানাকি জয়।

জয় জয় ওস্তাদ সুবেদার কি জয়।

জয় জয় ওস্তাদ ঝাঁকসো কি জয়।

জয় জয় মাস্টার সিরাজ কি জয়।

জয় জয় ওস্তাদ সুবেদ আলি কি জয়।[১]

এইভাবে নিজেদের গুরুদের জয়ধ্বনি দেয়।

তারপর শুরু হয় আসর বন্দনা, আসর বন্দনার সময় নাচিয়েরা প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে হাত জোড় করে যন্ত্রবাদকদের দিকে তাকিয়ে আসর বন্দনা শুরু করেন। তারপর এক একটি গানের কলি শেষ হয়ে যাবার পর ডানদিকে ঘুরে যান। এইভাবে গাইতে গাইতে আবার যন্ত্রবাদকদের দিকে এসে সমাপ্ত হয় আসর বন্দনা। আসর বন্দনার সময় অনেক দেবদেবীর বন্দনা করা হয়। তার মধ্যে অতি প্রচলিত একটি বন্দনা গান লিপিবদ্ধ করা হল —

জগৎ জননী মাগো তারা

জগৎকে তরালি আমারে কাঁদালি

আমি কি মা তোর চরণ ছাড়া

জগৎ জননী মাগো তারা।

দিবা অবসানে রজনীকালে

দিয়েছি সাঁতার শিবদুর্গা বলে,

মাগো জীর্ণ তরী, তুমি হও কাণ্ডারী

ডুবল ডুবল তরী ভবেরই তাড়া

মাগো জগৎ জননী তারা

কোথায় মা তুই একর্ম শিখিলি

দ্বিজ রামপ্রসাদে দিয়ে সাড়া

মা হয়ে পাঠালি মামীদের পাড়া
কোথায় গিয়েছিলি এ কর্ম শিখিলি
মা হয়ে সন্তান হারা
জগৎ জননী মাগো তারা।

এই গানগুলির মধ্য দিয়ে আমরা শিল্পীদের বিনয়ভাবের পরিচয় পাই। তাঁরা এটা বিশ্বাস করেন যে, আসরে দেবী সহায় না হলে তাঁরা দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হবে না। তাই তাঁরা গানের শুরুতে দেবীকে আসরে ডাকেন সহায়তা করার জন্য।

বৈঠকি বা খেমটা গান

আসর বন্দনার পর শুরু হয় ছোকবাদের বৈঠকি বা খেমটা গান। যে ছোকরাটি বয়ঃকনিষ্ঠ সেই প্রথমে গান গায়। তারপর একে একে বড়রা গান করতে আসেন। গানগুলি পূর্বে ওস্তাদরা নিজে রচনা করতেন। কিন্তু বর্তমানে হিন্দি বাংলা ছায়াছবির বহুল প্রচলিত গান গীত হয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রে। এই গানগুলি সাধারণত আদি রসাত্মক হয়ে থাকে। একটি পুরানো গান উদাহরণ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হল —

ওরে আমার নাইয়া
আজ উজানে চল রে মাঝি
তোমারি নাউ বাইয়া।
নদীর পথে কুলের ধারে
পাটের ক্ষেতে পাশে রে
আজ সাঁঝেতে চল রে মাঝি
যাইব গান গাইয়া।
বধুঁ আমার শুনলে গান
আসবে যে গো ধাইয়া

বধুঁর দেখা পাইলে মাঝি
দিব আমার হিয়া।।[৫]

ছড়াগান

ছোকরাদের বৈঠকি গান শেষ হয়ে যাবার পর ছড়াগান গাইতে আসেন দলের খলিফা বা মাস্টার। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত করে অবিরাম গতিতে গেয়ে চলেন। একঘেয়েমি কাটিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে ও মনোগ্রাহী করে তোলার জন্য মধ্যে মধ্যে দোহারকি উচ্চস্বরে গাহেন ছড়া গানের ভুয়া অংশটি। তাতে ছড়াদারেরও কিছুটা বিরতি হয় ও নতুন কিছু ভেবে নেবার সময় পান। বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে ছড়াগান তৈরি হয়। আলকাপের উৎপত্তি, সংশ্লিষ্ট দলের শিল্পী সমাজ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ইত্যাদি নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে ছড়াগান গাওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ জঙ্গীপুর বাজনগর নিবাসী ওস্তাদ ঝাঁকসুর শিষ্য প্রয়াত সুবল সবকার ওরফে সুবল কানার গাওয়া আলকাপের সৃষ্টি তত্ত্ববিষয়ক একটি ছড়া উদ্ধৃত হল —

প্রথমে মোনাকসার বোনাকানা
আলকাপ গান করেন রচনা
তারপরেতে সুবেদার আলি ভাই
বাড়ি তাঁর মালদহতে হয়।
তারপর ঝাঁকসু সরকার নামটি শুনি
তাঁর জঙ্গীপুরে বাড়ি জানি।
আলকাপে সে বিখ্যাত রে ভাই।
জাগুরুদ্দিন যাহার নাম
তার নুরপুরেতে হয়গো ধাম
ঝাঁকসু-জাগু একসঙ্গেতে গায়।

তারপর মকবুল হোসেন নামটি শুনি
তাঁর রাজমহলে বাড়ি জানি।
সেও কিন্তু মন্দ নয় রে ভাই
সুধীর চন্দ্র যাহার নাম
তার সাগর দীঘি হয়গো ধাম।
সিরাজ মাস্টার তারে রেখেছিল ভাই।।
মোজায়েল নইমুদ্দিন নামটি শুনি
তারা দুইজনাতে বন্ধু জানি
তাদের দলটা মন্দ নয়রে ভাই।।
মনকির আলি নামটি শুনি।
তার গোবিন্দপুর বাড়ি জানি।।
বরকত আলি তার পার্শ্বতে রয়।।
কার বা কত করব নাম
এবার শোনেন সুবল কানার গান।
এই বলে ভাই
দশের কাজে প্রণাম জানাই।।
এবার দীনবন্ধু ছাড়া কেউতো আর নাই
তাই ওস্তাদ আমায় ভেবে বলে
গুরুর চরণ রাখ দিলে
ভবপারে যাবার চিন্তা নাই।

কাপ

সূচনাপর্বে আলকাপের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক ছিল কাপ। কিন্তু বিস্তার ও রূপান্তর পর্বে এসে পঞ্চরস আলকাপে কাপের গুরুত্ব ক্রমশ

ক্ষীণ। যেখানে কাপের মাধ্যমেই রাত অতিবাহিত হত সেখানে বর্তমানে কাপের জন্য বড়জোর একঘন্টা সময় দেওয়া হয়। কারণ এখন বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় পালাভিনয়ের উপর। সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, স্বামী-স্ত্রী দ্বন্দ্ব, মহাজন জমিদারের শোষণ অত্যাচার ভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে কাপ পরিবেশিত হয়। এগুলি শুনে দর্শকরা হাসেন বটে কিন্তু ফলগুধারার মত দর্শকদের অন্তঃকরণ তীব্র কটাক্ষের শরাঘাতে ব্যঙ্গবিদ্ধ হয়। একটি বহুল প্রচলিত কাপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক —

তিনকড়ির কাপ (ভূতের কাপ)

তিনকড়ি গরিব লোক। সংসারে ছেলে আর বউ। তিনকড়ি বিয়ের সময় মহাজনের কাছে টাকা, স্বর্ণকারের কাছে সোনার গয়না ধার নেয়। তাদের টাকা শোধ করতে পারে না তিনকড়ি, এদিকে সুদ বাড়তে বাড়তে আসলের কয়েকগুণ হয়ে যায়। মহাজন ও স্বর্ণকারের ভয়ে তিনকড়ি বাড়িতে থাকতে ভয় করে। একদিন দুপুরবেলা তিনকড়ি বাড়ি এসে খেতে বসেছে! মহাজন ও স্বর্ণকার খবর পেয়ে সেইসময় আসে বাড়িতে। তিনকড়ি উপায় না পেয়ে একটা নির্দিষ্ট দিনে তাঁদের আসতে বলেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁদের পুরো টাকা মিটিয়ে দেবে।

নির্দিষ্ট দিনে সকাল থেকে তিনকড়ি মৃতের মত পড়ে রইল এবং তার স্ত্রী ছেলেকে পাশে বসিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে নির্দেশ দিল। এদিকে স্বর্ণকার ও মহাজন দেখে ভারি বিপদ।

তাঁরা মরার কারণ জানতে চাইলে তার বউ বলে যে কয়েকদিন ধরে সে কিছু খেতে না পেয়ে মারা গেছে। অবশেষে ছেলে ও বউয়ের অনুরোধক্রমে মহাজন ও স্বর্ণকাব মৃতদেহ নিয়ে চলল শেষকৃত্য করতে। শ্মশানে শবদেহ শুইয়ে রেখে স্বর্ণকার চলল কাঠ কিনতে এবং মহাজন চলল ডোমকে খবর দিতে।

এদিকে তিনকড়ি বাঁধন খুলে খাটে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকল। যেমনি

তারা উভয়ে মরদেহের কাছে আসে তেমনি তিনকড়ি মহাজন স্বর্ণকারকে ভূতের মত ভয় দেখাতে শুরু করে। সে বলে যে, তাদের বংশে কাউকেই বাতি জ্বালাতে সে রাখবে না। সে আরও বলে যে তারা যদি উভয়ে তার বাড়িতে পাঁচ হাজার টাকা করে দেয় তবে তাদের ছাড়বে। তারা প্রাণে বাঁচতে তা মেনে নেয়। সে তখন আবার মনে করিয়ে দেয় যে, যদি তারা তাদের কথা না রাখে তাহলে সে তাদের শাস্তি দেবেই। স্বর্ণকার মহাজন প্রাণের দায়ে সন্ধ্যা হবার আগেই তিনকড়ির বউয়ের হাতে টাকা দিয়ে আসে। তিনকড়ির বুদ্ধির কাছে স্বর্ণকার ও মহাজনের পরাজয় ঘটে।[৫]

পালা

আলকাপ গানের শুরুতে বা বিকাশ পর্যায়ে পালা বা বই বলে কোন আঙ্গিক ছিল না। যাত্রাপালার অনুকরণেই পালার অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে আলকাপে। বর্তমানে সামাজিক সমস্যামূলক পালা আলকাপ গানে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু বিস্তার পর্বে পালাগুলি ছিল পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও রূপকথাধর্মী। এগুলি মিলনান্তক। এতে কোন কোন কাহিনীর স্বাভাবিক পরিণতি ট্র্যাজিক বা করুণাত্মক হলেও শেষ হয় কৃত্রিম মিলনে। আলকাপ পঞ্চরস দলের কারোরই কোন নির্দিষ্ট পালা নেই। যদি কোন দলের একমাস ধরে একটানা একই জায়গায় গান হয়, তাহলে তাদের প্রত্যেক দিনই ভিন্ন ভিন্ন পালা আসরস্থ করতে হয়। বহুল প্রচলিত পালাগুলির মধ্যে কিছু কিছু হল লায়লা মজনু, রাজা হরিশচন্দ্র, কালু ডাকাত, সতী রূপবান, সত্য বিচার। কয়েক বছর ধরে কলকাতার চিতপুরের যাত্রাদলগুলির যে পালাগুলি এলাকায় জনপ্রিয় সেইগুলি পরের বছর আলকাপ পঞ্চরসে অভিনীত হচ্ছে।

পাল্লাগান

আলকাপ গানে অনেক সময় দুই দলের লড়াই হয়। তবে আজকাল তা দেখা যায় না বললেই চলে। এক জায়গায় বহুদিন ধরে গানের আসর বসলে বেশ কয়েকটি দল পর্যায়ক্রমে আসে। আগের দলের বিদায়ের রাতে

এবং নতুন দলের আগমনের রাতে আলকাপের আসরে সাধারণত দুই দলের লড়াই বা পাল্লাগান হত। পাল্লাগান সাধারণত জুয়াড়িদের দ্বারা পরিচালিত আসরেই বেশি হয়। জুয়াড়িরা বড় অংশের দর্শক টানতে এবং বেশি জুয়া হবার লোভে এই ধরনের গানের আসর বসান। লড়াইয়ের আসরে একটা মেডেল ও একটা কলা টাঙ্গানো থাকে। যে দল জেতেন তিনি পান মেডেল আর পরাজিতের ভাগ্যে কলা। প্রতিযোগিতা সাধারণত দুভাবে হয়ে থাকে — কাপে কাপে লড়াই আর ওস্তাদে ওস্তাদে ছড়ার লড়াই। ওস্তাদে ওস্তাদে ছড়ার লড়াইয়ের প্রধান বিষয়গুলি হল — নারী-পুরুষ, রাম-রাবণ, রাধা-কৃষ্ণ ইত্যাদি। সাধারণত শ্রোতারা বা আয়োজকরা প্রতিযোগিতার বিষয় নির্দিষ্ট করে দিতেন। প্রথমে একটি দল অন্য দলের প্রতি কিছু প্রশ্ন রেখে যান তারপর অন্যদল উঠে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আরো কিছু প্রশ্ন রাখেন প্রথম দলের প্রতি। এইভাবে প্রতিযোগিতা চলে সারারাত, কখনো একপ্রহর বেলা পর্যন্ত এগিয়ে আসে। একদল অন্যদলকে ব্যঙ্গ করে নানারকম উক্তি করে। একে বলে ঠ্যাসমারা। পাল্লাগান বা প্রতিযোগিতামূলক গানের সঙ্গে ছড়া গানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার ব্যাপারে তর্যাগানের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তর্যাগানে কাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা হয় না বা তর্যাগানে আলকাপ গানের পাল্লাগানের মত মাঝে মাঝে কাপ বা ছোকরার গান উপস্থাপিত হয় না। তবে আলকাপ গানে এটা যে তর্যামূলক কবি গানেরই প্রভাব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গুমানি কবিয়ালের বহু আসরে প্রতিদ্বন্দ্বী বসন্ত সরকার ঝাঁকসুর সঙ্গে বহুদিন আলকাপ গান করেছেন। তার মত বহু কবিয়াল পরবর্তীকালে আলকাপ গানে আসেন। সুবেদ আলি, লম্বোদর মণ্ডল প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে করা যায়। আলকাপ গানের পাল্লামূলক গানে প্রতিযোগিতার অবসান না হলে শেষে উভয় ওস্তাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ছড়া প্রতিযোগিতা হত, তাকে বলা হত 'বোল কাটাকাটি'। কোন ওস্তাদের বেশি দেরি হলেই তাকে পরাজিত বলে ধরে নেওয়া হত। উদাহরণস্বরূপ যম সাবিত্রী বিষয়কেন্দ্রিক বোল কাটাকাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল।

যম ঃ এস ভাই আসরে বোল কাটিব দুজনা।

সাবিত্রী ঃ বোল কাটিব দুজনা ভাই
শুনবে বসে দশজনা।

যম ঃ একা নারী নির্জন বনে
কাঁদ তুমি কিসের জন্যে
খুলে আমায় বল না।

সাবিত্রী ঃ স্বামী আমার শুয়ে আছে
সন্ধ্যা লেগে আসিতেছে
জাগাই আমি কি প্রকারে
সেটাই আমার ভাবনা।

যম ঃ কি নাম তোমার কোথায় বাড়ি
মিথ্যা বল না ও সুন্দরী
মিথ্যা বলা মহাপাপ যে
তুমি তা জান না।

সাবিত্রী ঃ মিথ্যা বললাম কেমন করে
বুঝিয়ে দাও আজ আমারে
প্রশ্ন এত কি জন্যেতে
তাই আমারে বল না।

যম ঃ স্বামী তোমার মরে গেছে
বলছ তুমি শুয়ে আছে
এটা মিথ্যা বলা হল না!

সাবিত্রী ঃ ও যে আমার কোলে শুয়ে আছে
মহাসুখে নিদ্রা গেছে।
দেখতে তুমি কি পাচ্ছ না।[২]

দ্বৈত গান

আলকাপের পালা শেষ হয়ে যাবার পরও যদি দর্শকরা গান শুনতে চান তাহলে দ্বৈতগানের আয়োজন করা হয়। আসর বন্দনা, বৈঠকি, ছড়া, কাপ, পালা প্রভৃতির যেমন নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমিক অনুষ্ঠান আছে, তা দ্বৈতগানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন অনুষ্ঠান নেই। পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো কখনো কাপের মধ্যে, কখনো পালার মধ্যে বা আবার কখনো পালা শেষ হয়ে যাবার পর অনুষ্ঠিত হয়। দ্বৈত গানে সাধারণত কপ্যা বা অভিনেতা ও নাচগানে পটু একজন ছোকরা অংশগ্রহণ করেন। এই ধরনের গান প্রেম প্রীতি ভালবাসা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গাওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বহুল প্রচলিত একটি দ্বৈত গীতি উদ্ধৃত হল —

পুরুষ (কপ্যা বা অভিনেতা) ঃ

সাঁঝের বেলায় কলস কাঁখে
কে গো তুমি রও
আড় নয়নে ঘোমটা টেনে
হেসে কথা কও,
কন্যা পরাণ জোড়াও।

নারী (ছোকরা) ঃ

কোন বা দেশে থাক তুমি
কোন বা দেশে ঘর
তরী বেয়ে যাচ্ছ তুমি
কি নাম তোমার?
ও তুমি কাহার কুমার?

পুরুষ ঃ নন্দালয়ে থাকি আমি
নন্দের নন্দন
রাখাল রাজা নামটি রাখে
সুবল সুজন
কন্যা বলিলাম এখন।

নারী ঃ রাখাল হয়ে সাজি আজ
কিসের আশায়
ভাঁওতা জলে নৌকা পড়লে
প্রাণে বাঁচা হবে দায়
তখন কি করিবে উপায়

পুরুষ ঃ দুই হাতে ধরিব চেপে
বামে দিব মোড়া
ভাঁওতা জলে নৌকা পড়লে
পালে দিব উড়া
নৌকা লাগবে কিনারা।

নারী ঃ চিনেছি চিনেছি তোমায়
ওহে কর্ণধার
কূলে হতে তুলে নাও
নৌকার উপর
তোমার কিসের এত দর?

পুরুষ ঃ কূল হতে তুলে নেব নৌকার উপর
ভাইটাল সুরে গান গেয়ে

প্রাণ জুড়াব তোমার
কন্যা বামে বসনা এবার।[৬]

টেলার

কিছু কিছু দল আসর বন্দনার পর মূকাভিনয় জাতীয় একপ্রকার আঙ্গিক আসরস্থ করে। সুবল কানা, বাবলু, ফুলচাঁদ মণ্টুর দলে যে টেলারগুলি বেশি করে দেখেছি সেগুলি হল মহীরাবণ বধ, মহিষাসুর বধ, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, দুই সতীনের লড়াই প্রভৃতি।

উৎসপঞ্জি

১. ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মে তারিখে মালদা জেলার ইংলিশবাজার থানার অন্তর্গত রামকেলীর মেলায় ইলিয়াস খলিফার দলের আলকাপের আসর থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।
২. ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দেব ১৮ নভেম্বর তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জ থানার ভবানীবাটি গ্রামে হারেজ আলি খলিফার দলের আসর থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।
৩. বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার পাকুড় থানার অন্তর্গত ইলামি গ্রামের অধিবাসী প্রবীণ শিল্পী হরেরাম সরকারের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।
৪. মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার অন্তর্গত সুন্দরপুর গ্রামনিবাসী প্রখ্যাত সঙাল করুণাকান্ত হাজরা ওরফে কে কে হাজরার কাছ থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।
৫. ওস্তাদ ফিরোজ আলি মণ্ডল কর্তৃক রচিত ও সৈয়দ খালেদ নওমান কর্তৃক সংগৃহীত। মুর্শিদাবাদ চর্চা-সম্পাদক প্রতিভারঞ্জন মৈত্র. পৃষ্ঠা ২১০।
৬. মালদা জেলার ইংরেজ বাজার থানার অন্তর্গত চণ্ডীপুর গ্রামনিবাসী দুখু খলিফার কাছ থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

আলকাপের প্রবাদপুরুষ ওস্তাদ ঝাঁকসু
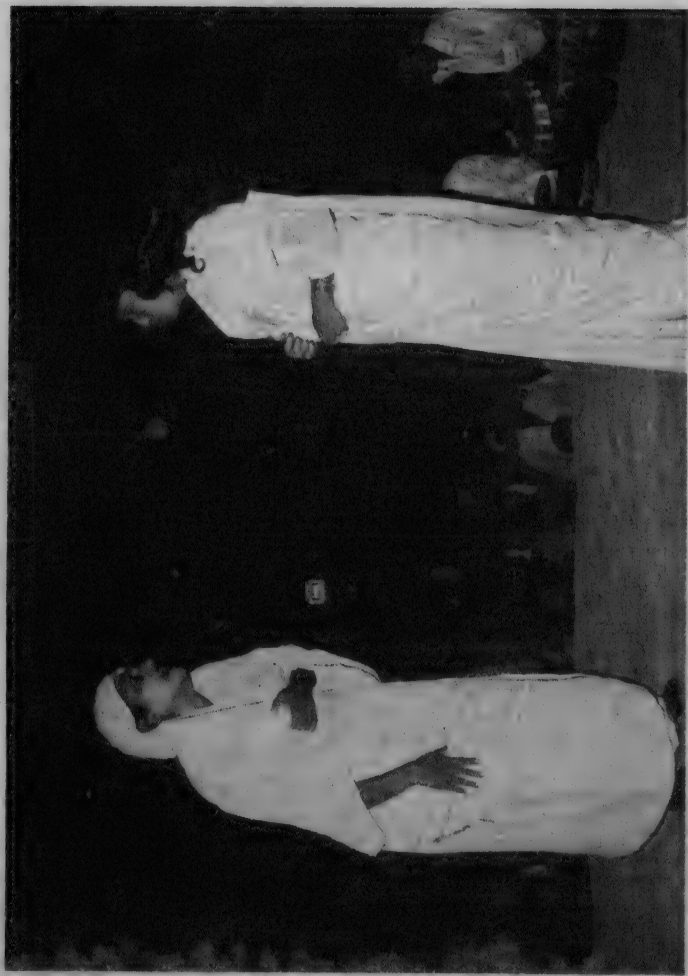
আলকাপের দুই শিল্পী

ষষ্ঠ অধ্যায

আলকাপের নাট্যধর্ম

বাংলার লোকনাট্যগুলির মধ্যে আলকাপ অন্যতম। যে কোন লোকনাট্যেই নাটকের সাধারণ ধর্ম রক্ষিত হয় বলেই তা নাট্য পর্যায়ভুক্ত। তর্জা, ঝুমুর, কর্তাভজা প্রভৃতির মধ্যে নাট্যধর্মের পরিমাণ সেরকম থাকে না বলেই তা লোকনাট্যের পর্যায়ভুক্ত হয় না। খন, ধাম, ব-মেলা, মাছানি, ডোমনি, গম্ভীরা, লেটো, ছৌ, মনসার গান, বনবিবির পালা লোকনাট্যের মত আলকাপে নাটকীয় ধর্ম ব্যাপকভাবে থাকে বলেই তা লোকনাট্যের শ্রেণীভুক্ত। কাহিনী, গতিবেগ, সংঘাত, আকস্মিকতা, নাট্যোৎকণ্ঠা, নাট্যশ্লেষ, চরিত্র সৃষ্টি, সংলাপ প্রভৃতি নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলকাপ লোকনাট্যে কতখানি বিরাজমান তা বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

অ্যারিস্টটল নাটকের ছয়টি অংশের কথা বলেছেন। যথা কাহিনী (Plot), চরিত্র (Character), রচনাশৈলী (diction), ভাব (thought), দৃশ্য (Spectacle) এবং সঙ্গীত (Melody)। এই ছয়টি অংশের মধ্যে তিনি প্লটকেই সর্বপ্রধান বলেছেন। (We maintain, therefore, that the first essential, the life and soul so to speak of tragedy in the plot......),[১]

লোকনাট্য আলকাপের আসর বন্দনা, বৈঠকি গান, ছড়াগান প্রভৃতি

অংশ বা আঙ্গিকে কোন কাহিনী থাকে না কিন্তু কাপ ও পালার আঙ্গিক দুটি একটি কাহিনীকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে। উভয় আঙ্গিকের কাহিনীতেই আরম্ভ, বিকাশ ও পরিণতি বর্তমান থাকে। তবে কাহিনীগুলি অধিকাংশই সহজ-সরল। থিয়েটার বা নাটকে যেভাবে কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাজন রীতি কঠোরভাবে মেনে চলা হয়, আলকাপ লোকনাট্যের কাহিনী বিন্যাসে তা দুর্লভ। অধিকাংশই কাপ বা পালার কাহিনীরই সমাপ্তি ঘটে মিলনের মাধ্যমে। কাহিনীর পরিণতিতে ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয় সূচীত হয়। আলকাপ লোকনাট্যের কাহিনীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক বা একাধিক উপকাহিনী জুড়ে দেওয়া হয় সার্থকতার সঙ্গে। সাউজির কাপ, উদার কাপ, মোড়লের কাপ, কালু ডাকাত পালা, সতী মায়ের ছেলে পালা প্রভৃতির মধ্যে এক বা একাধিক উপকাহিনী যুক্ত হয়ে মূল কাহিনীকে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় করেছে। এমনকি কিছু আলকাপ দল ও আসরের শুরুতেই মূকাভিনয়ের মত একটি আঙ্গিক উপস্থাপন করছে। এই অভিনয়ে একাধিক চরিত্র থাকে এবং তার মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনীও থাকে। মূকাভিনয়গুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল দুই সতীনের ঝগড়া, সাঁপুরের বিয়ে, মহিষাসুর বধ প্রভৃতি।

নাটকের দ্বিতীয় অন্যতম প্রধান ধর্ম হল গতিবেগ (action)। শ্লেগেল তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'Dramatic Literature'-এ বলেছেন, 'Action is the true enjoyment of life, nay life itself'.

গতিশীল দৃশ্যে আমাদেব চিত্ত যেমন আন্দোলিত হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না।[২] এই গতি পাত্র-পাত্রীদের আগমন-নির্গমন, অঙ্গ সঞ্চালন, সংলাপ প্রয়োগ, কৌতূহল, উত্তেজনা, অবিরাম, অবিচ্ছিন্নতা প্রভৃতির মাধ্যমে নাট্যগতিবেগ সঞ্চারিত হয়।

অন্যান্য বহু কিছুর মত নাটকীয় গতিবেগের তারতম্য ঘটে নাগরিক-গ্রাম্য, শিষ্ট-অশিষ্ট, অলোক-লোক প্রভৃতি স্তরের তারতম্যের কারণে। প্রখ্যাত সমালোচক লোকনাট্য তত্ত্ববিদ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'বাংলা

লোকনাট্য সমীক্ষা' শীর্ষক গ্রন্থে নগর জীবনের সঙ্গে লোকজীবনের পার্থক্যের কতগুলি বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

১) সমাজের আদিম পর্যায়ে লোকরীতির ভিত্তি (Folk Ways) গড়ে উঠলেও আদিম পর্যায়ে সমাজের প্রত্যেকটি লোকের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক মান একরূপ বলে, জনসংখ্যা অল্প ও বসতি অতি ঘনিষ্ঠ বলে সামাজিকদের মধ্যে সংস্কৃতিগত কোন পার্থক্য দেখা দিতে পারেনি। সুতরাং সমাজও লোকস্তর ও অলোকস্তর ওই দুই পর্যায়ে বিভক্ত হয়নি।

২) বিবর্তনের ফলে সমাজ কৃষিস্তরে উন্নীত হওয়ার পবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য লোকবসতি কেন্দ্রীয় বসতি থেকে নতুন নতুন ভূমিতে বা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ায় ও সামাজিকদেব মধ্যে ক্রমে সাংস্কৃতিক মানের তাবতম্য দেখা দেওয়ায় সমাজে শিষ্ট ও অশিষ্ট, গ্রাম্য নাগরিক, লোক অলোক বিভাগের অবকাশ সৃষ্টি হয়েছিল।

৩) যে কারণে জনগোষ্ঠীর একাংশ লোকস্তরে নেমে যেতে বা থাকতে বাধ্য হয়েছে সেই কারণটি আপাতদৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক বলে মনে হলেও আসলে তা অর্থনৈতিক। কেননা সাংস্কৃতিক মানবৃদ্ধির সুযোগসুবিধা অর্থনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতার উপরেই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে।

৪) যতদিন সমাজে শ্রেণি বিভেদ থাকবে, অর্থনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন গ্রাম্যজীবন ও নাগরিক জীবনের ব্যবধান ঘুচবে না। ফলত সাংস্কৃতিক পার্থক্য প্রকট হয়ে থাকবে বলেই সমাজ থেকেও লোকস্তর বিলুপ্ত হবে না।

৫) গ্রাম্য হইলেই ব্যক্তি যেমন লোকস্তরের অর্ন্তভুক্ত হয় না তেমনি নাগরিক মাত্রেই শিষ্ট নহে। গ্রামের জনবিন্যাসে স্তরভেদ আছে, নাগরিক জীবনেও তা বর্তমান। গ্রামের শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন শ্রেণি গ্রামে বাস করলেও এই শ্রেণি লোকস্তরের লোক নয়। তেমনি

নগরের অর্থসংহৃতিহীন ও অশিক্ষিত মুটে মজুর শ্রেণি নগরের বস্তিতে বা ফুটপাতে বসবাস করলেও আসলে তা লোকস্তরেরই লোক। গ্রাম্যদের মধ্যে যার অর্থনৈতিক সামর্থের অভাবে সংস্কৃতিতে অনগ্রসর হয়ে প্রাচীন সংস্কারের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তারা যেমন লোকশ্রেণির অন্তর্গত, তেমনি নাগরিকদের মধ্যে যারা ঐ একই কারণে আদিম মানসিকতার সংকীর্ণতা অতিক্রম করতে পারেনি তারাও লোকস্তরেই পড়ে রয়েছে। সুতরাং তা মেনে নিতে হবে যে, লোকস্তর কেবল গ্রামেই নেই, নগরেও তার অস্তিত্ব আছে। আদিম স্তরের লোক মানসিকতা ও আচার বিচার বির্বতনের ফলে ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে লোক অলোক সকল মানুষের মানসিকতা ও আচার বিচারের মধ্য দিয়ে অলক্ষ্যে প্রবাহিত হলেও সংস্কৃতির মানের তারতম্যের ভিত্তিতেই কোন ব্যক্তিকে লোক শ্রেণির এবং কোন ব্যক্তিকে অলোক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

৬) জীবনে Folk Ways-এর প্রাধান্য কতখানি থাকলে ব্যক্তিকে লোক পংক্তিতে স্থান দিতে হবে এবং কত কম থাকলে অলোক বা সুসংস্কৃতি বলে গণ্য করতে হবে তার পরিমাণ কোন সমাজবিজ্ঞানী আজ পর্যন্ত সঠিক নির্ধারণ করতে পারেননি। কিন্তু মোটামুটি অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাজনিত বা নঞ-ভাবকেই প্রধান ভিত্তি করে লোক অলোক পার্থক্য কল্পনা করা হয়ে থাকে।[৩]

আলকাপ অধ্যুষিত এলাকার জনজীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকনাট্য আলকাপের স্তর বিন্যাসের পর্যায়ে পর্যায়ে নাটকীয় গতিবেগের যাত্রাগত পরিবর্তন সূচীত হয়েছে। আলকাপের সূচনাপর্বে কাপগুলি গানে গানে পরিবেশিত হত। তখন নাট্যগতিবেগ ছিল অত্যন্ত মন্থর বা শ্লথ। তখন মানুষের অবকাশ ছিল অত্যন্ত বেশি। তখন সন্ধ্যায় আসর বসত এবং সূর্যোদয়ের পর অনেক বেলা পর্যন্ত চলত। তাছাড়া সঙ্গীত প্রেমী সঙ্গীত পিপাসু মানুষ গানে বিভোর হয়ে অবকাশ সময় কাটাতেন। ফলে কাহিনীর মধ্যে অধিক গানের ব্যবহার থাকায় নাট্যকাহিনীর গতিবেগ মৃদু

হয়ে যায়। জামাই আনার কাপ, দ্বিতীয় বিবাহের কাপ, কাশিমের কাপ প্রভৃতি কাপগুলিতে গানে গানেই অভিনীত হয়। (সংকলন অধ্যায়ে নথিভুক্ত করা আছে।)

আলকাপের পরবর্তী পর্যায়ে ঝাঁকসুর সময়ে আলকাপের নামকরণ হয় আলকাপ পঞ্চরস। তখন আলকাপের মধ্যে পালা আঙ্গিকের আগমন ঘটে। আসর বন্দনা, বৈঠকী গান, ছড়াগান কাপের পর যাত্রার মত কাহিনী সর্বস্ব পালাভিনয় শুরু হয়। এই পর্যায়ে কাপ ও পালার মধ্যে সঙ্গীতের প্রাধান্য কমতে শুরু করে। পূর্বে যেখানে কাপের কাহিনী কেবল গানে গানে গীত হবার মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলত সেখানে কাপের সময়সীমা সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় গানের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে সীমিত সময়ের মধ্যে ঘটনার উপর নির্ভর করে কাহিনীর পরিণতি দ্রুত ত্বরান্বিত কবা হল। ফলে ঘটনার প্রাধান্য এবং সঙ্গীতের হ্রাসের ফলে নাটকীয় গতিবেগের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেল।

বর্তমানে বেশ কিছু দল আলকাপের আসরের সময় সীমাকে বড়জোর ৫/৬ ঘন্টার মধ্যে সীমায়িত করে ফেলেছেন। তার অন্যতম প্রধান কারণ হল আলকাপ অধ্যুষিত এলাকার আর্থ-সামাজিক জীবনের পরিবর্তন।

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে মানুষের অবকাশ অনেক বেশি। কিন্তু আলকাপ অধ্যুষিত এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চল গঙ্গা ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত। পাশাপাশি কলকাতা বন্দরকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ফরাক্কা থেকে বল্লালপুর, চাঁদপুর, আমুথ, আহিরণ হয়ে জঙ্গীপুর পর্যন্ত প্রায় ৬০ কি. মি. দীর্ঘ ফিডার ক্যানাল কাটা হয়েছে। তাতে বহু চাষী তাদের কৃষিজমি হারিয়ে অন্য পেশা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। উপরন্তু ফিডার ক্যানাল অনুর্বর হওয়ায় ফিডার ক্যানালের পশ্চিম পাড়ে লক্ষ লক্ষ একর জমি জলনিমগ্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বহরমপুর থেকে ৩৪নং জাতীয় সড়ক ধরে উত্তরবঙ্গের দিকে যেতে জঙ্গীপুর পার হলেই রাস্তার দুধারে এই দৃশ্য চোখে পড়ে। ফলে এলাকায় গড়ে ওঠা বিড়ি শিল্পের শ্রমিক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করতে

হচ্ছে। ফলে কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনে মানুষের পৌষমাস থেকে শুরু করে বৈশাখ মাস পর্যন্ত যে পূর্ণ অবকাশ ছিল তা আর নেই। ফলে সারারাত জেগে রসপিপাসা নিবারণের ধৈর্য আর এলাকার মানুষের থাকে না। ফলে আসরের সময় সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে এবং সময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য কাহিনীকে দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য সঙ্গীতের সংখ্যা কমিয়ে গতিবেগ তুলনামূলকভাবে বাড়ানো হয়েছে। তবুও আলকাপের কাপ বা পালার গতিবেগ থিয়েটার নাটকের মত তীব্র নয়। তার অন্যতম কারণ, এখনও আলকাপ অধ্যুষিত এলাকার জনজীবনে বিড়ি শ্রমিক হলেও নগর জীবনের আলোকপ্রাপ্ত মানব জীবনের মত গতিময় হয়নি।

নাটকের অন্যতম তৃতীয় ধর্ম হল সংঘাত বা Conflict। ফার্ডিনান্ড ব্রুমেতিয়ের শ্লেগেল, নিকল প্রভৃতি নাট্য সমালোচক নাটকীয় গতিবেগ সৃষ্টির জন্য সংঘাতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সংঘাত নানাভাবে সৃষ্টি হতে পারে। এক অদৃশ্য দৈবশক্তির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব, নায়কের সঙ্গে শয়তানের দ্বন্দ্ব, সমাজ শক্তির সঙ্গে ব্যক্তিশক্তির দ্বন্দ্ব, চরিত্রের অভ্যন্তরে-প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির, হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে কর্তব্যবোধের, সমাজ চেতনার সঙ্গে ব্যক্তি চেতনার, অপরিমিত উচ্চাকাঙক্ষার সঙ্গে সীমায়িত সামর্থের, স্বাদেশিকতার সঙ্গে ব্যক্তি অনুরাগের, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, এক জীবননীতির সঙ্গে অপর জীবননীতির প্রভৃতি নানাধরনের দ্বন্দ্ব হতে পারে।

লোকনাট্য আলকাপে উপযুক্ত দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে কেবলমাত্র নায়কের সঙ্গে শয়তানের দ্বন্দ্ব বা ধর্মের সঙ্গে অধর্মের, ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের, ভালর সঙ্গে মন্দের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এক অদৃশ্য দৈবশক্তির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব যেভাবে ট্রাজেডি নাটকে দেখা যায় তা আলকাপ লোকনাট্যের কাপ বা পালার মধ্যে আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। চরিত্রের অভ্যন্তরে প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের যে দ্বন্দ্ব তা আলকাপে অনুপস্থিত। কারণ লোকজীবন এখনও গভীর জটিলতার আবর্তে জড়িয়ে পড়েনি! আলকাপের মধ্যে বক্‌কনমারা কাপে দরিদ্র তাঁতি দুঃখুর সঙ্গে মোড়লের দ্বন্দ্ব, ডোমনি

কাপে চরিত্রহীন ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে পতিব্রতা ডোমনির দ্বন্দ্ব, মোড়লের কাপে দরিদ্র প্রজাদের সঙ্গে জমিদারের নায়েবের দ্বন্দ্ব, কাশি যাওয়া কাপে অর্থলোভী পুরুত মামার সঙ্গে ভাগ্নের দ্বন্দ্ব, সম্পত্তিভাগ কাপে ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব, সন্তানের অধিকার কাপে প্রকৃত পিতার সঙ্গে পালক পিতার দ্বন্দ্ব, মোড়ল হওয়ার পরীক্ষার কাপে দুই ভাইয়ের বৌয়ের দ্বন্দ্ব, দুঃখিনীর কাপে ননদের সঙ্গে কুটিল বৌদির দ্বন্দ্ব, কালু ডাকাত পালায় শুভবুদ্ধির সঙ্গে অশুভশক্তির দ্বন্দ্ব, রজকের ছেলে পালায় রজকের সঙ্গে রাজার দ্বন্দ্ব প্রভৃতিভাবে দ্বন্দ্ব সংঘাত দেখা যায়। কিন্তু সকল দ্বন্দ্বই চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের একই চরিত্রের হৃদয়ের অভ্যন্তরে নয়। সমস্ত দ্বন্দ্বই মোটা দাগে দেখানো হয়, সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায় না।

নাটকের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল আকস্মিকতা বা Unexpectedness। এ প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের মন্তব্য — 'Such incidents have the very greatest effect on the mind when they occur unexpectedly.......'[৪]

ঘটনা চরিত্রের সন্নিবেশে আকস্মিকতার মাধ্যমে নাট্যগতিবেগ সৃষ্টি হয়। প্রবেশ, প্রস্থান দর্শকদের কাছে পূর্ব থেকে জানা নয় বলে এর আকস্মিকতা চিত্তকে উৎসুক ও কৌতূহলী করে তোলে। যখন কোন দৃশ্যের রসে দর্শকদের মন অভিভূত থাকে, তখন নাট্যকার হয় সেই দৃশ্যের স্বধর্মী চরিত্রের আকস্মিক আগমন ঘটিয়ে রসের প্রবাহকে বেগবান ও ঘনীভূত করে তোলেন অথবা সেই দৃশ্যের বিধর্মী চরিত্রের অবতারণা করে বিরুদ্ধ রসের প্রতিঘাত দ্বারা দৃশ্যরসের প্রবাহকে উচ্ছ্বসিত, আন্দোলিত ও আলোড়িত করে তোলেন।

আলকাপ লোকনাট্যে তিনবারের কাপে বোন মালতীর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য তিন দাদা তিনজন পাত্র খুঁজে নিয়ে এলেন। প্রত্যেকেরই দাবি তার পাত্রটাই সেরা। এই নিয়ে তুমুল ঝগড়া। তা দেখে বোন মালতীর আত্মহত্যা। মালতীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রথম পাত্র যখন শপথ নিল, ঘটনার অনুকূল আকস্মিকতা ঘটিয়ে অপর দুই পাত্রও একই শপথ নিল।

অন্যদিকে কালু ডাকাত পালায় অসহায়া মালিনীকে চরিত্রহীন লোকেরা যখন লাঞ্ছিত করছে তখন পরিত্রাতা হিসাবে কালু ডাকাত-এর আগমন ঘটিয়ে প্রতিকূল আকস্মিকতা দেখানো হল। এভাবে বহু কাপ-এ ও পালায় এই নাট্যধর্ম বর্তমান। কিন্তু তিন দিক ঘেরা মঞ্চে এই আকস্মিকতা যতখানি দেখানো সম্ভব হয় ততটা উন্মুক্ত দর্শকবেষ্টিত আসরে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

নাটকের পঞ্চম ও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নাট্যোৎকণ্ঠা অথবা Suspense । এর ফলে দর্শক উত্তেজিত আগ্রহ নিয়ে নাট্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। এ সম্পর্কে রোনাল্ড পিককের মন্তব্য সংঘাত অপেক্ষাও বিস্ময়, উত্তেজনা নাটকীয়তার জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয়। (It is commonly held that conflict makes drama but surprise and particularly tension, are the truer symptoms.)।

আলকাপের বক্কন মারা কাপে দুঃখুকে যখন বস্তায় পুরে নদীর জলে ফেলবার জন্যে মোড়ল নিয়ে যাচ্ছে তখন দর্শকের মনে কি হয় কি হয় ভাব জাগ্রত হয়ে নাট্যোৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। দুঃখিনীর কাপে বৌদি ননদকে শাস্তি দেবার জন্য পুজোর নাম করে তার স্বামীকে তার বোনকে আনতে বলে। তার স্বামী কিন্তু তার বৌয়ের অসৎ উদ্দেশ্যর কথা উপলব্ধি করে মুখ ঢাকা অবস্থায় তার শাশুড়িকে আনে। তখন দর্শকদের মধ্যে তার পরিণতি কি ঘটবে তা জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং নাট্যোৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। দুই ভাইয়ের ঝগড়া কাপে বড় ভাই যখন তালগাছে তালপাতা কাটতে উঠেছে তখন ছোটভাই কুঠার দিয়ে গাছের গোড়া কাটতে শুরু করে। দর্শক উত্তেজিত আগ্রহ নিয়ে এই নাট্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করে।

নাটকীয় গতিবেগ সৃষ্টির আর একটি উপায় হল নাট্যশ্লেষ অথবা Dramatic Irony। নাট্যকার ঘটনা ও সংলাপের দ্বারা সুকৌশলে নাট্যশ্লেষ সৃষ্টি করেন। অভিনেতা মঞ্চে একরকম কথা বললেন ও আচরণ করলেন, কিন্তু পূর্বে হয়তো এমন ঘটনা ঘটে গেছে যাতে তার সেরকম কথা বলা ও আচরণ করা সঙ্গত ও স্বাভাবিক নয়, এই পূর্ববর্তী ঘটনা দর্শকদের

জানা বলেই তার অভিনেতার কথা ও আচরণের অসঙ্গতি ধরতে পারলেন। এইভাবে নাটকীয় ঘটনা জানার ব্যাপারে যখন অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে ব্যবধান ঘটে তখনই নাট্যশ্লেষ দেখা যায় ঃ (....and this difference necessarily arises when ignorance of important facts of which mea: while the spectators are in possession.)[২]

ল্যালহা স্বামীর কাপে তার স্ত্রী যখন তার স্বামীকে উদ্ধার করার জন্য রাজকন্যার কাছে প্রেম নিবেদন করছে তখন নাট্যশ্লেষের সৃষ্টি হয়। অনুরূপ ধরনের ঘটনা সাইকেল ঘড়ির কাপ, বলদ ওড়ার কাপ, মাছ ধরার কাপ, উদার কাপ প্রভৃতির মধ্যে পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধারণ দর্শক নাটকে একটা চিত্তাকর্ষক গল্প পেতে চায়। তাই কতকগুলি চমকপ্রদ ঘটনা সমাবেশের দ্বারা গল্পটিতে গতিবেগ দিলে এরা খুশি। কিন্তু নাটকে কাহিনী ঘটনাসমূহ এবং পরিস্থিতি যদি চরিত্রবিকাশের সহায়ক না হয় তা হলে তা নাটকের ত্রুটি বলে বিবেচিত হয়। এজন্য নাট্যবচনার ক্ষেত্রে চরিত্র চিত্রণকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়। সমালোচক W. H. Hudson-এর ভাষায় ঃ— 'Characterisation is the really fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic work.'[৩]

সক্রিয় আকোধর্মী অন্তর্দ্বন্দ্বমুখি চরিত্রই অধিক প্রশংসনীয়। অন্যান্য লোকনাট্যের সঙ্গে আলকাপ লোকনাট্য কাপ ও পালার চরিত্রগুলি সক্রিয় ও আবেগধর্মী বটে। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বমুখিতার অভাব দেখা যায়। ওস্তাদ বা খলিফা কাপ ও পালায় চরিত্রেব তুলনায় কাহিনীকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কাহিনীকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তার মূল লক্ষ্য, কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চরিত্রকে তার প্রয়োজন হয়। চরিত্র-চিত্রণ কবতে গিয়ে তার সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলার অবকাশ কম। তাছাড়া তা অধিকাংশ দর্শকের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হবে এবং রসোত্তীর্ণতার পথে একটা বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। ফলত তার পালা বা

কাপ জনপ্রিয়তা হারাবে। অবশ্য কিছু কিছু পালাকার একই সঙ্গে মানসিক দ্বন্দ্বের বাহ্যিক রূপদান এবং Dramatic Relief বা নাটকীয় প্রশান্তি প্রদানের জন্য বিবেক জাতীয় চরিত্র, ফকির পাগল, চারণকবি প্রভৃতির মাধ্যমে গানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তা কাপে মোটেই দেখা যায় না।

নাটকে নাট্যকারকে সবকথা বলতে হয় পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মাধ্যমে। নাটকে নাট্যকার নীরব, মুখর শুধু চরিত্রগুলি। ঔপন্যাসিক তাঁর পাত্র-পাত্রীর সঙ্গেই চলেন। পাত্র-পাত্রী কথা দিয়ে যা বোঝাতে পারেন না তিনি বিশ্লেষণ করে আগের সঙ্গে পরের আনুপূর্বিক সম্পর্ক তুলে ধরে তা বুঝিয়ে দেন। কিন্তু নাট্যকার নেপথ্যে থাকেন বলে সবকিছুর ভার তার সংলাপকেই বহন করতে হয়। কাহিনী রচনা অর্থাৎ তার অগ্রগতি সৃষ্টি চরিত্রের প্রকাশ বা বিকাশন সবকিছুর দায়িত্বই সংলাপের।[৮]

সংলাপ সার্থক হয়ে ওঠে যখন তা পরিবেশ ও চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি বজায় রাখতে পারে। পরিবেশ, দৃশ্য, চরিত্রের রূপসজ্জা, চরিত্রের পরিচয় পেয়ে দর্শকদের মনে সংলাপের যে ভাষা প্রত্যাশিত হয়ে ওঠে তা চরিত্রের মুখে যদি না শোনা যায় তবে তাদের প্রত্যাশা রূঢ়ভাবে খণ্ডিত হয় এবং চরিত্রের সঙ্গে তাদের সহমর্মিতা গড়ে উঠতে পারে না। সংলাপ যেখানে চরিত্রের শুধু মুখের কথা নয়, সমগ্র সত্তার অভিব্যক্তি হয়, সেখানে সংলাপ সার্থক। আর সংলাপ যেখানে শুধু কেবল ভাষার অহেতুক আড়ম্বর মাত্র, স্থান কাল পাত্রের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সেখানে তা চরিত্রকে কলের পুতুল করে মাত্র, সজীব মানুষে পরিণত করতে পারে না।[৯]

পূর্বেই বলা হয়েছে আলকাপের কাপ বা পালার কোন লিখিত রূপ থাকে না। দলের ওস্তাদ বা খলিফা শিল্পীদের কাছে কাপ বা পালার আনুপূর্বিক কাহিনী বলে দেন এবং কার চরিত্রের প্রকৃতিটি কিরকম তার একটা মোটামুটি ধারণা দিয়ে দেন। শিল্পীরা আসরে গিয়ে নিজেরা তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করে সংলাপ উপস্থাপন করেন। ফলে সংলাপ বহুক্ষেত্রেই ঘটনা ও পরিবেশ অনুযায়ী হয়। মুখস্থ বিদ্যা হলে আসরে স্থিত

অন্যান্য চরিত্রের সংলাপে কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে ঘটনা বা পরিবেশের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠত।

আলকাপের সংলাপ বহু স্থলেই চরিত্রানুযায়ী হয়। রাজা, মহাজন, জমিদার, শিক্ষক প্রভৃতি চরিত্রের সংলাপ কেন্দ্রীয় ভাষায় হয়ে থাকে। অবশ্য আলকাপের অধিকাংশ শিল্পীরাই নিরক্ষর ও অল্পশিক্ষিত হওয়ায় সেই ভাষায় সংলাপ প্রদানে সক্ষম হন না। ফলে আঞ্চলিক ভাষায় টান বা আঞ্চলিক শব্দ এসে পড়ে। মাতাল, জুয়াড়ী, চোর-ডাকাত, মজুর, ধোপা, প্রভৃতি চরিত্রের সংলাপ আঞ্চলিক ভাষার উপর ভিত্তি করে প্রয়োগ করা হয়। এই শ্রেণীর চরিত্রের সংলাপে গ্রাম্য ও অশ্লীল শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন 'কায় পুত্র বিচার' কাপে জনৈক ক্ষেত মজুর দূরবর্তী স্থানের হাটে যাবে তাই তার স্ত্রীকে তাড়াতাড়ি ভাত রান্না করতে বলছে। কিন্তু স্ত্রী তার স্বামীকে রাতের পান্তাভাত খেয়ে যেতে বলছে। স্বামীও তা খেতে নারাজ, তার গরম ভাত চাই-ই। এমত অবস্থায় তার সংলাপ—

'মাগী তোকে ভাত রানতে কহছি তুই ভাত র‍্যানহা দিবি না। যা শালী তুই তোর বাপের বাড়ী যা।'

এখানে অন্যান্য গ্রাম্য শব্দের পাশাপাশি শব্দদুটি অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু এটা গ্রাম্য সরলতা ও সবলতার লক্ষণ, তার মধ্যে অশ্লীলতা কিছু নেই। তাছাড়া এই ধরনের সংলাপ ব্যবহারের মাধ্যমেই ঘটনা ও পরিবেশকে মূর্ত করে তুলেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলেও এটি ত্রুটি তো নয়ই বরং এটা নাটকীয় গুণ। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সমালোচক বিনয় ঘোষের মন্তব্য—'অনেকের ধারণা, আলকাপ শিল্পীরা অশিক্ষিত গ্রাম্য সাধারণ বলে তাদের আলকাপের মধ্যে অশ্লীলতা গ্রাম্যতা প্রভৃতি দোষ দেখা যায়। অর্থাৎ যেন তারা শিক্ষিত ও শহুরে হলে তাদের অভিনয় অনুষ্ঠানে এই দোষগুলি থাকত না, এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। বস্তুত অপসংস্কৃতির প্রধান উপাদান হিসাবে অশ্লীলতার উৎস ও বিকাশকেন্দ্র হল শহর, গ্রাম নয়। গ্রাম্য শিল্পীদের শহরের রাজা মহারাজারা অশ্লীলতার চর্চায় উৎসাহিত করেছেন তাদের শহরে নিয়ে এসে অবশ্য গ্রামের জমিদাররাও তাই করেছেন।'[১০]

নারী চরিত্রের শিল্পীদের সংলাপে মেয়েলি টান 'ওলো' 'হ্যাগা' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার প্লুতস্বরের প্রাধান্য চোখে পড়ে। অথচ নারী চরিত্রের রূপদান অধিকাংশ স্থলেই পুরুষ শিল্পী ছোকরা বা নাচিয়েরা করেন। ওস্তাদ বা খলিফারা ৭/৮ বছর বয়স থেকেই ছোকরা শিল্পীদের অনুশীলন দিতে থাকেন। মেয়েদের মত হাবভাব, চলাফেরা, কথাবলা, বাগভঙ্গি, বাকবিন্যাস সমস্ত কিছু তাদের রপ্ত করতে হয়, ফলে এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে।

নাটকের আর একটি সাধারণ উপকরণ বা উপাদান হল সঙ্গীত। সঙ্গীত থেকেই বিভিন্ন দেশের নাটকের উদ্ভব হয়েছিল। ''থেস্‌পিসের আগে গ্রীস নাটকের সংলাপের ব্যবহার ছিল না। কোরাস দলের নায়ক থেস্‌পিসই প্রথম সঙ্গীতের সঙ্গে সংলাপ ব্যবহার করেন এবং সেই সংলাপই নাটকের সংলাপে পরিণত হয়। সঙ্গীত থেকে নাটকের উৎপত্তি হলেও নাটকের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত নাটকের মধ্যে রইল বটে, কিন্তু তার স্থান হল সংলাপ ও নাট্যক্রিয়ার সহযোগী অঙ্গরূপে। যে কোরাস সঙ্গীত নাট্য সংলাপের উৎপত্তির পূর্বে সর্বময় প্রাধান্য লাভ করেছিল, সংলাপ নাটকের সর্বপ্রধান অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে সেই শুধু কেবল ক্রিয়ার সাময়িক বিরতি ও পরবর্তী ক্রিয়ার প্রস্তুতির যোগসূত্র এবং নাট্যঘটনার ভাষ্যরূপে নাটকের মধ্যে টিকে রইল।''

লোকনাট্যের স্তরবিন্যাসের পর্যায়ে পর্যায়ে দেখা যায় সঙ্গীতের প্রাধান্য ক্রমশঃ কমে আসছে। আলকাপের সূচনাপর্বে আলকাপের আঙ্গিক ছিল আসর বন্দনা, বৈঠকি গান, দ্বৈতগীতি ও কাপ। প্রত্যেকটি আঙ্গিকেরই একমাত্র উপকরণ বা উপাদান ছিল গান। এমনকি কাপগুলিও বিভিন্ন চরিত্রের গানের উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। মধ্যে মধ্যে দু-একটি সংলাপ থাকত। এ প্রসঙ্গে নারী-পুরুষের কাপ, কাঠুরিয়ার কাপ, জামাই আনার কাপ, দ্বিতীয় বিবাহের কাপ, ব্রাহ্মণীর কাপ, ছেলে বিক্রয়ের কাপ, শুলেব কাপ প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

পরবর্তীকালে কাপগুলির মধ্যে সঙ্গীতের প্রাধান্য থাকল ঠিকই তবে পাশাপাশি চরিত্রের মুখ দিয়ে সংলাপের ব্যবহারও বৃদ্ধি পেল। সাউজির কাপ, উদার কাপ, ল্যালহা স্বামীর কাপ, জমিদারি উচ্ছেদের কাপ, তিন বরের কাপ প্রভৃতির মধ্যে যেমন গানে গানে উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে তেমনি নাট্য সংঘাতকে তীব্র করা এবং গতিবেগ আনার জন্য সংলাপের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

ঝাঁকসুর সময়ে আলকাপের মধ্যে যাত্রাপালার অনুকরণে পালা-গান নামে এক আঙ্গিকের আগমন ঘটে। খলিফা ও দর্শকদের কাছে পালাগানের গুরুত্বের বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে অন্যান্যর সঙ্গে কাপেরও দেহাবয়ব সংকুচিত হয়। তখন কাপের মধ্যে বড়জোর দু-একটি গানের ব্যবহার থাকল। যে সকল দল এখনও আলকাপকে পুরোপুরি অপেরা বা যাত্রাপালায় পরিণত করেনি তার কাপকে এভাবেই পরিবেশন করে থাকেন।

ঝাঁকসুর সময় পর্যন্ত পূর্বের আঙ্গিক আসর বন্দনা, দ্বৈতগীতি, বৈঠকি গান, ছড়াগান প্রভৃতিতে গানের প্রাধান্য তো থাকতই পালার মধ্যে ও গানের গুরুত্ব সংলাপের মত সমান থাকত। সঙ্গীত সংলাপের অপরিহার্য পরিপূরক ও রস সঞ্চারের প্রধান উপকরণ বা উপায় হিসাবে বিবেচিত হত। সংলাপ যে ভাবকে উদ্রিক্ত করত, সঙ্গীত সেইভাবকে সুরের তীব্র উদ্দীপনা দ্বারা সমগ্র দর্শক পরিমণ্ডলের শেষ সীমা পর্যন্ত সঞ্চারিত করে দিত। সমবেত গান, পাত্র-পাত্রীর গান, বিবেকের গান যন্ত্রসঙ্গীত দ্বারা দর্শকের মনকে সঙ্গীত সাগরে অবগাহন করানো হত।

কালের পরিবর্তনে নানা কারণে যখন ঝাঁকসুর পরবর্তীকালে আলকাপ পঞ্চরস গান কোনো কোনো দলের কাছে পঞ্চরস অপেরা বা শুধু অপেরায় পরিণত হল তখন কেবল কাহিনীভিত্তিক পালাগানই প্রাধান্য পেল। ফলে, বৈঠকি গান, দ্বৈতগীতি, ছড়াগান প্রভৃতির সঙ্গীত প্রধান আঙ্গিকগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি বাদ দেওয়া হল। পালাকেও ঘণ্টা ৩/৪-এর মধ্যে সমাপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা হওয়ায় সঙ্গীতের পরিমাণও তুলনামূলকভাবে কমে

গেল। পাশাপাশি যারা ঝাঁকসুর সময়কার আঙ্গিককে ধরে রাখার চেষ্টা করলেন তাঁরাও সঙ্গীতের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় কমিয়ে দিলেন। প্রায় সব দলেই বর্তমানে ছড়া গানটি হয় না। এর অন্যতম কারণ সময় সঙ্কট হলেও তাৎক্ষণিক ছড়াগান গাইবার মত প্রতিভাধর শিল্পীর অভাবও একটা বড় কারণ। তাঁরা পালার মধ্যে গানের ব্যবহার কাহিনীর প্রয়োজন ছাড়া কমিয়ে দিয়েছেন। শুধু দর্শক মনোরঞ্জনের জন্যই বৈঠকি, দ্বৈতগীতি প্রভৃতি অংশে গানের ব্যবহার রইল, কিন্তু পালা বা কাপ অংশে কাহিনীর প্রয়োজন ছাড়া কেবল দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য গানের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনেকখানি কমে গেল।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, আলকাপের কাপ ও পালা আঙ্গিকে যে পরিমাণ নাটকীয় ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে আলকাপকে লোকনাট্যের শ্রেণীভুক্ত করাটা অসমীচীন নয়।

উৎসপঞ্জি

১. Poetics – Tr. By Water P-38
অনুসূত্র ঃ অজিতকুমার ঘোষ ঃ নাটকের কথা, পৃঃ ১৩
২. অনুসূত্র ঃ ঐ পৃঃ ২
৩ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ঃ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, পৃঃ ২৮
৪. অনুসূত্র ঃ অজিতকুমার ঘোষ ঃ নাটকের কথা, পৃঃ ৯
৫. অনুসূত্র ঃ ঐ
৬. W. H. Hudson : 'An Introduction to the Study of Literature', P-223-224
৭. ঐ পৃঃ ১৮৬
৮ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ঃ নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, পৃঃ ২৩৮
৯. অজিতকুমার ঘোষ ঃ নাটকের কথা, পৃঃ ২৪
১০. বিনয় ঘোষ ঃ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭০
১১. অজিতকুমার ঘোষ ঃ নাট্যতত্ত্ব পরিচয়, পৃঃ ৫৭

সপ্তম অধ্যায়

সামাজিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আলকাপের ভূমিকা

অন্যান্য লোকনাট্যের মত আলকাপেরও একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন। শিল্পীদের লোকনাট্য আলকাপের মাধ্যমে আমাদের সমাজে নানা ধর্ম-বর্ণ-পেশার মানুষকে একই সূত্রে গ্রথিত করার বলিষ্ঠ প্রয়াস দেখা যায়। অন্যান্য লোকনাট্য-এর মতই আলকাপ কেবলমাত্র অবসর বিনোদনের বা স্থূল হাসি-ঠাট্টার উপকরণ নয়। লোকনাট্য আলকাপ আমাদের সমাজে প্রচলিত নানাধরনের বিভেদ প্রবণতাকে দূর করে আমাদের সমাজে মিলনের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। আলকাপ শিল্পীরা তাদের গান, ছড়া, কাপ, পালা এমনকি জীবনযাত্রার মাধ্যমেও সামাজিক সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত করেন।

আলকাপ গানে যন্ত্রসঙ্গীতের পর ছোকরা বা নাচিয়েরা আসর বন্দনা করার জন্য সকলে আসরে সমবেত হয়ে জয়ধ্বনি দেয়। এই জয়ধ্বনিতে যেমন হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর জয়ধ্বনি দেওয়া হয়, তেমনি একই সঙ্গে পির, ওস্তাদে, সুফি দরবেশদেরও জয়ধ্বনি থাকে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা থানার অধীনে কুলিয়াগ্রামে ১৯৮৭ খ্রিঃ ২৬

ডিসেম্বর তারিখে বাদল সরকারের দলের গানের জয়ধ্বনিটি লিপিবদ্ধ করা হল।

জয় জয় মা বাকবাদিনীর জয়,
জয় জয় ওস্তাদ তানসেনের জয়।
জয় জয় ওস্তাদ বোকাকানার জয়।
জয় জয় মাজা মঈনুদ্দিন চিস্‌তীর জয়
জয় জয় ওস্তাদ ঝাকসুর জয়।
জয় জয় সিরাজ মাস্টারের জয়।
জয় জয় গয়ানাথ সরকারের জয়।

এরই লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় এক কালের আলকাপের খ্যাতনামা শিল্পী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের আলকাপের শিল্পীগোষ্ঠীদের জীবনালেখ্য স্বরূপ 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে।[১]

আলকাপ দলে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম সম্প্রদায়েরই শিল্পীরা থাকেন। তাঁদের মতে দর্শক সাধারণকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে উক্ত দেবদেবী, ওস্তাদ, পির, সুফি দরবেশদের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনার জন্য জয় এবং উক্ত ব্যক্তিদের প্রতি স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতাবশতঃ তাঁরা এই জয়ধ্বনি দিয়ে থাকেন।

আসর বন্দনা শীর্ষক আঙ্গিকে শিব, কালী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর বন্দনা গান করা হয়। এটা ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়, আত্ম-নিবেদনের উদ্দেশ্যে, আশীর্বাদ প্রার্থনার উদ্দেশ্যে উভয় সম্প্রদায়ের শিল্পীরা একই সঙ্গে গেয়ে থাকে সরস্বতী বন্দনা —

এস গো মা সরস্বতী ডাকি মাগো তোমারে।
তুমি না তরালে মাগো কে তরাবে আমারে।।
কোথায় গো গণেশ জননী কণ্ঠে বিরাজ করেন তিনি।
করজোড়ে ডাকি মাগো এস আজি এই আসরে।।[২]

কালী বন্দনা ঃ—

মাগো কালী মনের কালি দূর
করগো আমার।
জ্ঞানের প্রদীপ দাও মা জ্বেলে
মুছে যাবে অন্ধকার।।
আমি অতি অভাজন
না জানি সাধন ভজন।
স্মরণ করিগো রাঙা চরণ
নমি মাগো শতবার।।[৩]

ছড়া গানের মধ্যেও সামাজিক সমন্বয়ের ঈঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় অগণিত নর-নারীর প্রাণ বিনষ্ট হয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার মাদকতায় উন্মত্ত হয়ে নির্দ্বিধায় একে অপরের বুকে ছুরিকাঘাত করেছিল। রাস্তাঘাট, নগর পল্লী রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনার প্রতি ধিক্কার জানিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার জন্য ছড়াগান গেয়েছিলেন আলকাপ শিল্পীরা।

চিন্তা করে দেখ মনে হিন্দু-মুসলমান।
এক মাতার সন্তান আমরা দুটি প্রাণ।।
যাকে বলে খোদা তায়ালা তাকেই বলে হরি।
তবে কেন ভাইয়ে ভাইয়ে করি মারামারি।[৪]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে ঃ

সোনার বাংলায় আমরা মানুষ কেন হলাম না।
আমরা নয়গো হিন্দু নয় মুসলমান।
জাতিতে সবাই যে সমান।।

শুধু ধর্মেতে হিন্দু-মুসলমান গো।
দেখুন খোদা হরি একজনা।।
দূর করুন ভাই মনের হিংসা।
অকাল মৃত্যুর এই যে নেশা।।
সবে আপন আপন বেঁধে বাসা গো।
কর্মে ধর্মে এগিয়ে চলুন না।।
হিংসার জন্য কুরু বংশ।
সমূলেতে হল গো ধ্বংস।।
ধর্মের জন্য ভগবান কৃষ্ণ গো
করেন পাণ্ডবের রথ চালনা।
সোনার বাংলায় আমরা মানুষ কেন হলাম না।[৫]

আলকাপ শিল্পীরা তাঁদের গানে ধর্ম বলতে মানবধর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষকে ভালবাসা। একের কল্যাণে বন্ধুভাবে অপরের এগিয়ে আসাকেই তাঁরা ধর্ম বলে মনে করেন। তাঁরা সকলকেই সমান চোখে দেখাটাকেই ধর্ম বলেন।

হেথা বাদশা ফকির সবায় সমান
হিন্দু শ্মশান বলে মুসলমানে গোরস্থান।
আবার এই খানেতে যিনি খোদা
সেইখানেতেই ভগবান।।
সনাতন রায় ভেবে বলে —
মুদলে চক্ষু যাব চলে
হিন্দু ভাইরা বলুন হরি, আল্লা বলুন মুসলমান।[৬]

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এপার বাংলা

ওপার বাংলার হিন্দু-মুসলমান একত্রে আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। শুরু হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ, মুকুন্দলাল দাস গান বেঁধেছিলেন দুই বাংলাকে এক করতে। আন্দোলনের চাপে পড়ে লর্ড কার্জন বাধ্য হয়েছিলেন ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল বাংলাকে খণ্ডিত করে, বৃটিশদের কূটচক্রজালে দেশের কর্ণধাররা জড়িয়ে পড়লেন। তার অনিবার্য ফল হল আত্মঘাতী দাঙ্গা। দেশভাগের পরে দুই দেশের মধ্যে যে বিদ্বেষের সম্পর্ক তাকে ব্যঙ্গ করে লোকশিল্পী আলকাপ প্রবাদ পুরুষ ওস্তাদ ঝাকসু গান বাঁধলেন, —

বাংলা মা তুই কাঁদবি কতকাল,
তোর সোনার অঙ্গ করল ভঙ্গ
রক্তধারায় লালে লাল।
মনে করি হলাম স্বাধীন
আমরা মাগো চির পরাধীন
হয়ে এমন বিশ্বের অধীন
অন্নবিনে নাজেহাল।।
লালমুখোরা গেছে চলে
যে কথায় যেও না ভুলে
কালো মুখেরা তলে তলে
আড়াল থেকে ছড়ায় জাল।।
দুই সতীনে চুলোচুলি
এর গালে চুন ওর গালে কালি।
চুলো নিয়ে বিবাদ খালি
ঘরের চালেই ধরায় জ্বাল
বাংলা মা তুই কাঁদবি কতকাল।'

ধর্মভিত্তিক দেশকে দুইভাগ করে স্বাধীনতা লাভের ফলে কার কতটুকু সুবিধা হয়েছিল বলা যায় না কিন্তু সাধারণ মানুষ যে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন অসুবিধেয় পড়েছিলেন তার বিবরণ পাওয়া যায় তাদের প্রতিনিধি রূপে আলকাপ শিল্পীদের মুখে—

হায়রে হায় কেমনে বাঁচাব জান।
হল হিন্দস্থান আর পাকিস্থান।।
ভাই রাখে না ভাইয়ের মান
কেমনে বাঁচাব জান।।
মোরা হিন্দু-মুসলমান একই মায়ের সন্তান।
ভাইয়ের মুখ দেখতে ভাইকে ওনারা সব পাসপোর্ট চান।
কেমনে বাঁচাব জান।।

আলকাপ গানের মধ্যে দেশভাগের বিষয় নিয়ে দেশকে দুভাগ করার প্রতিবাদ করে অনেক ছড়া গান গাওয়া যায়। তার কারণ আলকাপ গানের বহুল প্রচলিত এলাকা হল মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলা। এই দুই জেলারই অঙ্গহানি ঘটে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধুনা বাংলা দেশের রাজশাহি জেলা গঠিত হয়েছিল। ফলে, জাতীয় কুটুম্ব পরিজনের মধ্যে এক এক আন্তর্জাতিক সীমারেখা দূরতিক্রম্য এক প্রাচীর গড়ে ওঠে। ফলে, একের সঙ্গে অপরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই ব্যথা-বেদনাকেই সমাজের সচেতনশীল অংশ হিসাবে লোকশিল্পীরা আলকাপ গানের মধ্যে ব্যক্ত করেন।

সামাজিক সমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন কাপ ও পালাতেও। পাল্লা বা প্রতিযোগিতামূলক গানে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে যে সকল প্রশ্ন সংশয় থাকে তা তুলে ধরে শেষ অবধি ধর্মবর্ণ সমন্বয়ের কথাতেই সিদ্ধান্ত টেনে আনা হয়। মিলনের বা সমন্বয়ের বক্তব্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণের কাপে দেখতে পাওয়া যায় চণ্ডাল বন্ধুর জন্য জনৈক ব্রাহ্মণ প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। কালু ডাকাত

পালায় কালু মুসলমান হয়েও জনৈক পতিগৃহ থেকে অত্যাচারিত হয়ে পালিয়ে আসা হিন্দু রমণীকে বোন বলে স্বীকার করে নেয় এবং বহুকাপে তাকে তার পতিগৃহে ফিরিয়ে দেয়।

জয়ধ্বনি, আসর বন্দনা, ছড়াকাপ পালার প্রভৃতির সঙ্গে আলকাপ শিল্পীদের সামাজিক জীবনযাত্রার মধ্যেও সমন্বয়ে সম্প্রীতির লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। আলকাপ শিল্পীরা হিন্দু-মুসলমান উচ্চনীচ নির্বিশেষে প্রথমে আসরে কপালে হাত প্রণাম করে তারপর আসরে একে একে উপবিষ্ট গুরুজন সকল শিল্পীকেই পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। তাদের মনে যে সম্প্রীতিবোধ থাকে তা প্রবল হয়ে ওঠে এবং অন্ধকারের গহ্বরে লুকিয়ে থাকা কলুষিত বিভেদ প্রবণতাকে বিদূরিত করতে উৎসাহী হয়। এমনকি তাদের রান্না খাওয়া, শয়ন, চলাফেরা কিছুর মধ্যেই ভেদাভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এভাবে আলকাপ শিল্পীরা তাদের গান, অভিনয়, জীবনযাত্রার মধ্যে এক সামাজিক সমন্বয়ের চিত্রকে দৃষ্টিগোচর করে তুলে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রলেপ বিস্তীর্ণ করে ভেদাভেদকে দূরীভূত করতে সচেষ্ট হন।

উৎসপঞ্জি

১. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ঃ মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাস, পৃঃ ৮১।

২. মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন রাজনগর গ্রাম নিবাসী প্রধান শিল্পী সুবেদ আলীর কাছ থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

৩. মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত সুজাপুর বামুনগ্রাম নিবাসী ওস্তাদ আবুল কাসেমের নিকট থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

৪. মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন মুকুন্দপুর নিবাসী প্রধান শিল্পী সাজিরুদ্দিন খলিফার নিকট থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

৫. বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার পাকুড় থানার অন্তর্গত গোপীনাথপুর নিবাসী আলকাপ শিল্পী মাস্টার ফুলচাঁদ সরকারের কাছ থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

৬. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ঃ মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাস, পৃঃ ৯৬।

৭. ঐ, পৃঃ ৩৮।

অষ্টম অধ্যায়

গণসংযোগের মাধ্যম হিসাবে আলকাপ

সৃষ্টির সূচনা পর্ব থেকেই সংযোগের অস্তিত্ব বিদ্যমান। যখন ভাষার আবিষ্কার হয়নি তখন মানুষ বিভিন্ন ইঙ্গিত, সংকেত ধ্বনির মাধ্যমে সংযোগ ঘটাত, ভাব বিনিময় করতো। মানবেতর প্রাণীও নিজেদের মধ্যে নানাভাবে মত বিনিময় করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই কান্নার মাধ্যমে নিজের অসুবিধার কথা প্রকাশ করে। ক্রমশঃ দু-একটি ধ্বনি এক আধটা অস্পষ্ট শব্দ প্রভৃতির মাধ্যমে মনোভাব ব্যক্ত করে। সংযোগ মাধ্যমের বিবর্তনের ইতিহাসও অনুরূপভাবে অগ্রসর হয়েছে। সমাজ বিবর্তন সূত্রে লক্ষ্য করা যায় কালে কালে সংযোগ মাধ্যমের রূপান্তর ও ব্যাপ্তি ঘটে। প্রাচীনকালে সংযোগ মাধ্যম হিসাবে বিভিন্ন প্রকার লিপি, চিত্র সংযোগ মাধ্যম হিসাবে ভূমিকা গ্রহণ করতো। সংযোগ মাধ্যম হিসাবে মুদ্রাযন্ত্র, বেতার, দূরদর্শন, সিনেমা, ভিডিও প্রভৃতি আবিষ্কারের পূর্বে হাটে হাঁড়ি ভাঙা, ঢোল সহরৎ, লোকনাট্য, লোকগীতি, লোককথা, পটচিত্র প্রভৃতি গণসংযোগ মাধ্যম হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। বর্তমানেও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রসূত উপরিউক্ত সংযোগ মাধ্যমগুলির চেয়ে লোক মাধ্যমগুলির গণসংযোগ মাধ্যম হিসাবে ভূমিকা অনেক বেশি ও প্রভাবশীল। প্রযুক্তিবিদ্যা প্রসূত মাধ্যমগুলির চেয়ে লোকমাধ্যমগুলি আপাত স্থূল হলেও গণসংযোগের ক্ষেত্রে আবেদন সাধারণ দর্শকশ্রোতাকুলের মনোগ্রাহী কারণ এলিট

সুবিধাভোগী শোষক স্বার্থান্বেষী শ্রেণীর দ্বারা পরিচালক আধুনিক মাধ্যম দর্পণগুলিতে তাঁরা নিজেদের জীবনযাত্রা, সুখ-দুঃখ, অর্থনৈতিক-সামাজিক, পারিবারিক সমস্যার ছবি দেখতে পায় না ফলে এগুলির সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলের বহু মানুষ এখনও পর্যন্ত আধুনিক সংযোগ মাধ্যমগুলি থেকে বাইরে থেকে গেছে স্বাধীনতার চার দশক পরেও। কিন্তু লোকমাধ্যমগুলির সঙ্গে তাঁদের এক আত্মিক যোগ বিদ্যমান। তাই প্রকৃত গণসংযোগ মাধ্যম হিসাবে মাধ্যমগুলি এখনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

লোকনাট্য আলকাপের আঙ্গিক উপস্থাপন রীতিভাব, বিষয়বস্তু প্রভৃতি লোকসাধারণের কাছে অত্যন্ত আদরণীয় ও গ্রহণীয়। ফলে, লোকনাট্য আলকাপের দ্বারা এক বলিষ্ঠ গণসংযোগ সংক্রমণ ঘটে। আলকাপে সাধারণ মানুষের শোষণ নির্যাতন নিপীড়ন, দুঃখ-দুর্দশা, হাসি কান্না, সুখ-দুঃখের কথা, হাসি-ঠাট্টা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মকভাবে পরিবেশিত হয়। কখনও গান বা ছড়ার মাধ্যমে আবার কখনও কাপ ও পালাভিনয়ের মাধ্যমে নানা সমস্যা সংবাদকে বিজ্ঞাপিত করেন আলকাপ শিল্পীরা। কখনও প্রচ্ছন্ন পরোক্ষভাবে আবার কখনও স্পষ্ট সরাসরিভাবে বিষয়বস্তুগুলি আসরস্থ হয়। লোকশিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও আলকাপের ভূমিকা অপরিসীম।

আলকাপ অধ্যুষিত এলাকায় শতকরা ৮০ ভাগ মানুষই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আলকাপ শিল্পীরা তাই কৃষকের অবস্থাটা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। কৃষকদের দুরবস্থা তাদের দুরবস্থা বলেই মনে হয়, তাঁরা কৃষকদের দুরবস্থার কথা গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেন —

হায় হায় দেশের একি হাল
যারা ক্ষেতে যোগায় ফসল,
তার ঘরেতেই নাইকো চাল।
মুখের গরাস লিলে কাড়ি

লিলে জমি, লিলে বাড়ি,

বড়লোকের জুলুমবাজী

সহিমু আর কতকাল

হায়রে কৃষক দেশের ইটা কেমন হাল।[১]

যে কৃষক অপরের মুখে অন্ন জোগায় সেই থাকে অর্ধাহারে বা অনাহারে। বড়লোক তার উপর অত্যাচার করে, নিপীড়ন করে, তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করে। আলকাপ শিল্পীদের প্রতিবাদী সত্তা গানের মধ্য দিয়ে এই অনাচারের বিরুদ্ধে খেদোক্তি প্রকাশ করেছেন।

বন্যা মানবজীবনে অভিশাপ। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে বা ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে কিভাবে বন্যায় মানুষের সর্বনাশ হয়েছিল তা নিয়ে দুজন আলকাপ শিল্পীর কাছ থেকে সংগৃহীত দু-খানি আলকাপ ছড়াগান উদ্ধৃত হল ঃ—

১৩৪৫-এর বন্যা

স্যারা দিলে সাঁওনা বানে

৪৫ সালের বানের ঠেলা

সকল লোকে জানে।

ভুতনি দিয়াড় ডুবে গেল

বাড়ি কত জনার ভেসে গেল

ভেসে গেল ভাঁত রাঁধিবার হাড়ি হে।

সাহেবগঞ্জ ভাই ভেসে গেল

এই কথাটি বলছি ভাল।

পাটনি দিয়ড় ভেসে গেল

ভেসে গেল মণিহারী

একে একে বানের কথা বলে দিতে পারি।

কাঁটাহা আর আমতল্লা
ঘরে পানি এক এক গলা।
দাদারে ডুবল চিলা ইমারি
এবারে বান হয়েছে ভারি।
দেবীপুর আর ভেলকা ডুবল
ডুবল মেযার হাট
এবারকার বান এসে ডুবাল ধানপাট হে ডুবাল ধানপাট।
মথুরাপুর আর খড়তলা হরিবাবুর ডুবল কলা
দাদাবে এবার বানে সবকিছু করলো সারা।
মিলকি মোহনপুব ডুবল ডুবল গোঁসইহাট
এবারে বানে চাষীরা ভাই হয়েছে কুপোকাত।
খেজুরিয়া গিয়ে দেখি খুব হয়েছে বান
বানের ঠেলায় ডুবে গেল সব ভাদোই ধান
বলতো কি বানের কথা, বলতে গেলে ঘুরে মাথা,
ডুবে গেল ভাই ফরাক্কা
ভেসে গেল লোকের হুক্কা
আলিনগর বালিয়াঁ গাঁ ডুবে শেষ হল হে
কুন কুন দেশেব লোক কুন কুন দেশে গেল হে।
কুন কুন দেশে গেল
এবারে বানে দেশের সর্বনাশ হল
বাঁশু গাঁ কেটে বাঁইয়া ভাই গঙ্গায় গেল ভেসে
কি খ্যায়া লোক প্রাণ বাঁচাবে হাতে নাইকো পাইস্যা হে
হাতে নাইকো পাইস্যা।[২]

১৯৭৮ এর বন্যা —

১৯৭৮ সাল পড়েছে হায় হাহাকার
বাংলার মানুষতো বাঁচবে না আর।
যাদের লাঙ্গল তাদের জমি
খাবার তো হবে না কমি
তাদের ঘরে ছেলেরা শুধু করে হাহাকার
বাংলার মানুষতো বাঁচবে না আর
তার কথা বলব কি আমি জানেন অন্তর্যামী
সকাল হলেই ঘরে ঘরে শুধুই বলে খাবার
বাংলার মানুষতো.. ..আর
অল্পে অল্পে এসব কথা জানাই এ সভাতে
দুঃখে আমার প্রাণ বাঁচে না শুনুন দশ জনাতে
বলি এ বছরের খবর।
হল কবর কত চাষের গরু
ঘরে ঘরে এবার হল মর্মান্তিক শুরু।
গরুর চারা বিনে
দিকবিদিকে যায়
বীরভূম বর্ধমানে কোথাও চারা মিলে নাই।
একথা বলব কারে শুনাবো কারে
দিব কারে ব্যথা
এসব কথা বলতে গিয়ে
ঘুরে আমার মাথা।
যাদের ঘরে কিছু আছে

ঘুরি তাদের পাছে পাছে
কিছু দাও কিছু দাও বলে
করি তারে প্রণাম
আমায় দেখে নয়ন বাঁকে
ধনী তাদের নাম।
যদি কোন বন্ধু কারো বাড়ি যায়
বন্ধুর আত্মা উড়ে যায়
এ শালা এল কেন? (২ বার)
ভাবে মনে চাইবে চাল কি ধান।
বাংলাদেশে পরেছে এই মহামারীর টান।
তার ছেলেকে বলে বল গিয়ে বাবা বাড়ি নাই
চালধানের মহা অভাব বাবা গিয়েছেন তাই।
এ আর করবো কত বাড়াবাড়ি
দুঃখে প্রাণ বাঁচে না
যতই বলব ততই বাড়বে
এ কবির রচনা
তাই গুরুর চরণ স্মরণ করে
অল্পে সাঙ্গ করি
মুসলমানে বলে আল্লা
হিন্দু বলে হরি।[৩]

ছড়া গান দুটিতে যথাক্রমে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের এবং ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের বন্যার বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে। বন্যায় কিভাবে মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল, মানুষ কিভাবে দিন কাটিয়েছিল অনটনের মধ্যে তার গীতি আলেখ্য এই

ছড়া গান দুখানি। এভাবে আলকাপ শিল্পীরা বিভিন্ন দুরবস্থার বর্ণনা দর্শক সাধারণকে আলকাপ গানের মাধ্যমে জানিয়ে গণসংযোগ মাধ্যম হিসাবে ভূমিকা পালন করে।

বন্যার মতই আরেকটি অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হল খরা। ১৯৮২ সালে খরার কবলে পড়ে মানুষ কিভাবে হাহাকার করে, কিভাবে বিপদের মধ্যে দিনযাপন করে তার বিবরণও পাওয়া যায় আলকাপ শিল্পীদের কণ্ঠে।

শিব কেবা জানে হে শ্যামচাঁদ তোমার লীলা
তুমি বংশীধারী লীলাকারী জগৎকে শুকাইলা।
শিব কেবা জানে..............................লীলা।
তুমি হরি আদি অন্ত কেবা জানে তোমার অন্ত
এ জগতে আজ পর্যন্ত কারে বা সুখ দিলা।
শিব কেবা জানে.................... ...লীলা।
১৯৮২-এর কথা অল্পে অল্পে বলি
ভুল-ত্রুটি মার্জনা করি পাড়বেন নাকো গালি।
এ যে মহাদুঃখের কথা।
অন্তরের ব্যথা সহা নাহি যায়
এসব কথা বলতে গিয়ে ভাসি বারিধারায়।
এইবার বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি বৃষ্টি হল ভাই
সেই বৃষ্টি পেয়ে চাষি আনন্দে লাফায়
নিযে লাঙ্গল গরু করল শুরু চাষ-আবাদের কাজ
যত দাগই থাকনা কেন চাষির নাইকো লাজ।
তাই বৃষ্টি প্রথমে পেয়ে লাঙ্গল নিয়ে কাজ করল শুরু
অন্য সব কাজ দূরে রেখে শুধু লাঙ্গল গরু

ধান বোনার কাজ শুরু হল দুঃখ হল দূর
আনন্দে নাচে চাষি ভাই
প্রথম সুযোগ পেয়ে এবার বুঝি দুঃখ দূরে যায়।
এইভাবে চাষ আবাদ হল বৈশাখ গেল
জ্যৈষ্ঠ এল ধেয়ে
এখনও চাষি আনন্দে ঘুরে জমির ধারে গিয়ে
এবার সামনে এল আষাঢ় মাস
ঘটল কিবে সর্বনাশ।
জমির ধান শুকিয়ে গেল জলের দেখা পেল না
আমাদের চাষির দলে দলে আরাধনা করে
এবার কিছু উপায় কর আমাদের তরে।
হিন্দুরা মাঠেব দিকে শুধু হরি বলে
এমন সময় ওগো হরি কেমন দুঃখ দিলে।
মনের দুঃখে চাষি কাঁদে
পড়েছি এক বিষম ফাঁদে।
এবার বুঝি ছেলে মেয়ে কিছুই বাঁচবে না
যা ছিল সব ফুরিয়ে গেল কি করব আর বেচাকেনা।
এবার মুসলমান দলে সবাই মিলে
আল্লা বলে ডাকে
ওগো আল্লা দয়াময় কি ঘটালে ঘটে।
এইভাবে সকলে দোয়া নামাজ করে।
খোদাগো মোদের এই শোনাজাত তোমার তরে।
এইভাবে চাষির দলে আবাধনা করে

নিরাশ হইয়া সবে ফিরে আপন ঘরে।
এল দুঃখের সাড়া সর্বহারা সবে চাষির দল
শুধুই মুখে বুলি তোলে দাও বিধাতা জল।
মাঠের ধান শুকিয়ে গেল লাগল আঘাত বুকে
জমির ধারে যায় না চাষি কঠিন মনের দুঃখে।
কেউবা ঐ ধান কাটিয়া বাড়ি গিয়া গরুকে খাওয়ায়
কেউবা দুঃখের জ্বালা সইতে নারে
তার পানে না চায়।
এ যে বিষম খরা, পাইনা তরা
দুর্ভাগ্য চাষির দল
জমি-জমায় পাম্পের দ্বারা দিল অনেক জল।
কিন্তু এ যে ভগবানের লীলা বুঝভারি কে বুঝতে পাবে
পাম্পের জলের ক্ষেতের ফসল কেউ বাঁচাতে পারে?
পাপে ধ্বংস হল ধান শুকালো ফসল তো হল না
শুধু দোষে ভগবানকে নিজের দিকে চায়লোনা।
যখন বিপদে তাহার তরে করে আরাধনা,
বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে তার নাম মনেও কেউ করে না।
এই যে কালের হাওয়া, কি বলব আর
দুঃখে প্রাণ বাঁচে না।
ধর্ম কর্ম দূরে গেল, শুধুই পাপের নিশানা।
এই পাপের তরে ঘরে ঘরে শুধুই উঠলো হাহাকার
বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ জেলায় দুঃখের নাইকো পারাপার।
এই কথা বলব যত বাড়বে অল্পে অল্পে সারি
মুসলমানে বলে আল্লা, হিন্দু বলে হরি।[১]

লোকশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আলকাপের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। দর্শক সমাজকে তাঁরা নানা বিষয়ে শিক্ষা দেন। এবার কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক যেগুলির মাধ্যমে লোকশিল্পীরা তাঁদের দর্শক সমাজকে লোক শিক্ষা দিয়ে থাকেন সামাজিক, আধ্যাত্মিক, পারিবারিক বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলেন।

লোকনাট্য আলকাপ গান, ছড়া, কাপ, পালা প্রভৃতির মাধ্যমে লোকসাধারণকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে শিক্ষিত করে তোলেন। শিব হচ্ছেন লৌকিক দেবতা, কৃষির দেবতা। শিবের বন্দনা আমরা বন্দনা গীতির মধ্যেও পেয়েছি। আলকাপ গানের মাধ্যমে শিবের নানা লৌকিক অলৌকিক দিককে তুলে ধরা হয়। কোথাও শিব একান্ত কাছের মানুষ কোথাও আবার অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। একটি শিব বিষয়ক আলকাপ গানের ছড়া উদ্ধৃত হল —

ও কে বুঝতে পারে ভোলা তোমার লীলা
লীলাকারী ত্রিশূলধারী ভাসাও শিলা
ও হে ভোলা তোমার লীলা কে বুঝতে পারে।
সন্ন্যাসী রূপ ধারণ করে ঝোলা লও ঘাড়ে
ঝোলা ঘাড়ে লয়ে তুমি দ্বারে দ্বারে যাও
লজ্জা কি লাগেনা তোমার ভিক্ষা করে খাও।
তোমার শ্বশুর দক্ষ রাজা যজ্ঞ করেছিল
তত কোটি দেবতাগণ নিমন্ত্রণ পাইল।
তোমায় কেন নিমন্ত্রণ দেয়না দক্ষরাজে
বিনা নিমন্ত্রণে তুমি বা যাবে কোন লাজে
আদ্যাশক্তি ভগবতীর দুঃখ হল ভারি
পরম দুঃখে ধুতুরা খেয়ে পৃথিবী গেল ছাড়ি।

তুমি পড়ে থাক শ্মশানে সাপ নিয়ে খেলা কর
লজ্জা কি মনে নাই হে তোমার শিব হরি হর।
এই কথা শুনে ভোলা রাগে কম্পমান
তাল বেতাল হয়ে গেল মর্ত্য দেবস্থান।
রাগের ভরে শিবভোলা কাঁপিতে লাগিল
রাগেতে ভগবতীকে ঘাড়ে তুলে নিল।
সেই না দেখে চক্রপাণি চক্রেতে কাটিয়া
ভগবতীকে করল ছিন্ন একান্ন ভাগ করিয়া
প্রত্যেকটি অংশ একেক জায়গায় পড়িল
সব জায়গাগুলি একটি করে তীর্থস্থান হল।
আনেসুর রহমান ভেবে বলে তোমার লীলা বুঝা দায়
বেদ বেদান্তে আদি অন্তে তোমায় খুঁজে পাই।[৭]

ছড়াগানটির ছন্দমিল অত্যন্ত দুর্বল হলেও দর্শক সাধারণের বোঝার উপযোগী করে দক্ষযজ্ঞের কাহিনীটিকে অবলম্বন করে শিব-সতীর মাহাত্ম্য লীলা প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় বিবাহের কাপ

বেটির গান ঃ নির্দয় হল পিতা মাতা
মম প্রতি নেই মমতা
এ জীবন আর বৃথা আমার হে।
বৌদেরকে মা বাসেন ভাল
মাখতে দেন সুগন্ধি তেল
পরতে দিচ্ছে পাটাম্বর শাড়ি হে।

আমার মাথায় উড়ছে ধুলো
জুটে না সরিষার তেল
পরতে দিচ্ছে সাদা মোটা খদ্দর হে।
বৌদেরকে মা দিচ্ছেন খেতে
মাছ মাংস পুরো বাটিতে
দধি মাখন ছানা ক্ষীর হে।
আমার জন্য আতব অন্ন
খেয়ে তৃপ্তি হয়না মন
আগুন দহিছে পরাণ হে।।

মা ঃ বেটি কি দুঃখ হয়েছে বল শুনি
কে বা তোরে বলিছে কটুবাণী শুনি

বেটি ঃ মাতা কি হবে বলিয়া গো তোমার কাছে
মা হয়ে দুই নজর কর
আমার পরাণ ফাটিছে মাতা
পরাণ ফাটিছে।

মা ঃ বেটি হয়ে বিধবা মাছ মাংস খাওয়া
তোমার নিষেধ সংসারে
সেইজন্যেতে দিনা খেতে আমি তোমারে।

বেটি ঃ আমার দাও দিয়ে বিয়ে বিধবা হয়ে
আমি থাকব কতদিন?
দিবা নিশি ভাবতে ভাবতে শরীর হল ক্ষীণ।

মা ঃ বিহা দিবাব হলে বেটি কহতে আর হত না
বিধবা হলে নারীর আর দ্বিতীয় বিহা হয় না।
লিখছে বেদ-পুরাণেতে আতব অন্ন হবে খেতে

করতে হয় একাদশীর উপাস
তবে হবে পাপের বিনাশ
মাছ মাংস ভোজন করলে ওরে
বাছাধন কাম রিপু ধরে।

বেটি ঃ দ্বিতীয় বিহা আর মাতা হবে না বা কেন
বেদ পুরাণে দ্বিতীয় বিহার দিয়ে যাই প্রমাণ
ত্রেতা যুগে বালী রাজার নারী তারা সতী
দ্বিতীয় বিহা হয়েছিল সুগ্রীবের সংহতি।
রামের সঙ্গে যুদ্ধ করে মরিল রাবণ
তার নারীকে বিহা করিল রাজা বিভীষণ।
বিচিত্রবীর্য রাজা যক্ষা রোগে মারা গেল
তার নারীকে দ্বিতীয় ব্যাসদেব বিহা করিল।
সত্যবতীর কথা মাতা কিছু বলে যাই
দ্বিতীয় বিহা করেছিল শান্তনু রাজায়।
একে একে পঞ্চ স্বামী কোন দেবীর হয়
দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী মিথ্যা কথা নয়।
রাধা সতীর পতি কৃষ্ণ বিখ্যাত সংসারে
দ্বিতীয় বিহা করেছিল আয়ান ঘোষরে
এইভাবেতে দ্বিতীয় বিহা অনেক হয়েছে।
সংক্ষেপেতে বললাম মাতা আমি তোমার কাছে
দ্বিতীয় পতি করে সতী আছে চিরদিন।

মা ঃ আমি করি মিনতি দশের প্রতি
অনুমতি দাও আমায়

দিব কিনা দিব বিহা বেটীর কথায়
আমার যত যেজন আছে
বসে বসে সেই জন ভাবছে
গোবিন্দ বলে বিহা দিলে
কুল মান সব রয়।

(বিয়া হবার পর)

বেটি ঃ মাগো মরার বাড়ি আর যাব না
যেতে আমার মন সরে না
তোরা কি পাগল হলি
খ্যাপার সাথে বিহ্যা দিলি
চোখ থাকতে কি মা কানা হলি।

মা ঃ বেটি অদৃষ্ট তোর যা হবার হয়েছে
খশুবাবার আর বল কে আছে
চুপ বেটি কাঁদিস না আর
নয়ন তুলে দেখ সংসারে
গোবিন্দ কয় যা হবার হয়েছে।

কাপটিতে মা মেয়ের গীতিময় সংলাপের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিবাহ বিষয়ে অনেক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। হিন্দু সমাজে দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ। বিধবাদের নানা কিছু বিধিপালন ও সংযমী জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। কিন্তু মেয়ে এভাবে জীবনকে অতিবাহিত করতে অনিচ্ছুক। তাই মেয়ের উক্তিতে দ্বিতীয় বিবাহের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি শুনতে পাই। কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ যে সুখকর হয় না তাও কাপটির মাধ্যমে দেখতে পাই।

দর্প মানুষের অন্যতম প্রধান শত্রু। দর্প মানুষকে নিয়ে যায় ধ্বংসের পথে। দর্প কিভাবে মানুষের সর্বনাশ করে থাকে তার বিবরণ দিয়ে লোকশিল্পীরা দর্প হতে বিরত থাকতে শিক্ষা দেন।

ও দেখ দর্প করে দশানন রাবণ।
দর্পতেই রাজা হারাল জীবন।
দর্প করে সীতা হরে
লয়ে গেল লঙ্কাপুরে।
অতি দর্পে হত লঙ্কা কি বলব আর
দর্পের কারণে রাবণ হল ছারখার
মহীরাবণ দর্প করে এল দেখ লঙ্কাপুরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে চুরি করে নিয়ে গেল পাতালপুরে
দুটো ভাইকে জোর করে বেঁধেছে রাবণের চরে
পরে হনু জানতে পেরে গেল পাতালপুরে
কালীর হাতের খাঁড়া ধরে মহীরে দুখান করে
পরে রানী জানতে পেরে এসে যুদ্ধ করে।
হনুমান ক্রোধে অতি তার উদরে মারে লাথি
রানীব দশমাসের গর্ভ ছিল অমনি ছেলে প্রসব হল
সেই ছেলে দর্প করে কেমন দেখ যুদ্ধ করে
হনুমান তারে বধ করে গেল দেখ লঙ্কাপুরে।
লঙ্কার যত বীর ছিল তারা সকলে মরিল
একশত পুত্র যার নয় লক্ষ নাতি
রাবণের দর্পের কারণে তাদের হয় দুর্গতি।
তারা সকলে মরিল রাবণ ভাবনাতে পড়িল
সেই রাবণও যুদ্ধ করে মরিল দর্প করে।
দ্বাপরেতে কংসরাজা দর্প করেছিল
দর্প করে কেমন দেখ যুদ্ধ আরম্ভিল।

তৃণবর্ত দর্প করে বৃন্দাবনে যুদ্ধ করে
রাখালগণের সঙ্গে দেখ মরিল পরাণে।
পুতনা দেখ ছুতনা করে বিষ স্তন পান করিয়ে
কৃষ্ণ বধিবারে তরে গেল নন্দের ঘরে
কৃষ্ণ তখন জানতে পেরে তাকেও বধ করে।
কৃষ্ণ গিয়ে মথুরাপুরে কংসকে বধ করে।
কংসকে বধ করে মাতা-পিতা উদ্ধার করে।
দেবগণ দর্প করেছিল তার সনে
দেবগণেরও কৃষ্ণ দর্পচূর্ণ করে।
দুর্যোধন দর্প করে রাজ্য নিল কেড়ে
পাণ্ডবগণ দেখ বনে বনে ফিরে
দেখ কৃষ্ণ সনে করুক্ষেত্রে যুদ্ধ হল
দেখ দুর্যোধন দর্প করে সমরে মরিল।
ভেবে পঙ্কজ দাস বলে এ কলিতে দপ করে মরবি সকলে।

ছড়াগানটিতে আখ্যান বর্ণনার মাধ্যমে দর্প করে কিভাবে রাবণ, কংস, দুর্যোধন একে একে ধ্বংস হল তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে লোকশিল্পী পঙ্কজ দাস আত্মপরিচয় দিয়ে দর্শক সাধারণকে দর্প থেকে দূরে থাকতে বলেছেন।

পল্লীগ্রামে এক সুলভ বৃক্ষ হল বাঁশ। বাঁশ কি কি কাজে ব্যবহৃত হয় তার বর্ণনা দিয়ে লোকশিক্ষা দিয়ে থাকেন আলকাপ লোকনাট্যের শিল্পীরা।

দেববংশ অবতাংশ তুমি ওহে বাঁশ
তুমি না থাকিলে দেশে হত না লোকের বাস।
রোদ-বৃষ্টি হতে আত্মরক্ষা করে নর

তোমার বিনাশ করি বান্ধিতেছে ঘর।
যখন হচ্ছে মরণ তখন করিছ বহন
বহুরূপে ধরে রক্ষা কর নর।
খঁটি খুঁটা দণ্ড বাতা তোমাতেই হয় ছাতা।
কতই প্রকাবে তুমি জানিছ সবারে
তোমা বিনা চলে এমন নেই কেউ সংসারে।
তোমা হাতে করে হাঁটে বৃদ্ধ নরনারী
সৌখিন যুবার হাতে তুমি হস্ত ছড়ি
লাঠিয়াল তোমায় হাতে পেলে
রাস্তা দিয়ে নির্ভয়েতে চলে।
কুলা পাইছ্যা চালনা দেখ
তোমা ছাড়া হয় না কো।
ধনুক রূপে পুরাকালে
রক্ষা করেছো সকলে
তোমার সাক্ষী বলে দেখ জমির দখল হে
পড়ে নাকো গোলে সব মিটে অবহেলে
পিঞ্জরা করে লোক পুষে শুকশারী
যে পিঞ্জরা তোমা হতে হতেছে তৈরি
ওস্তাদের হাতে পড়ে তুমি নানা রূপ ধরে
আছ প্রতি ঘরে, তুমি পর-উপকারে।
মাছ ধরিবার তরে আছ তুমি সব ঘরে
ছিপ, বিন্তি, ব্যান্যা তোমা ছাড়া হয়
গাড়ির হইছ ফর যাও দেশ দেশান্তর

নদীর ফরাসে ভর সইছ অক্লেশে।
তোমা হতে হয় বাঁশি সর্বলোকে জানে
গোলকনাথের হাতে ছিল মধুর বৃন্দাবনে।
শুনিয়া তোমার গান যমুন যেত উজানে
যত গোপনারী ছাড়ে ঘর বাড়ি
বাঁশিতে উন্মত্ত হয়ে পাছে যেত ধেয়ে,
দেখতে বৃন্দাবন কত হচ্ছে আমার মন।
গাইছে পঙ্কজ ভূষণ ধন্য হে বাঁশ তব জনম
তোমাতেই হয় কাগজ কলম হে কাগজ কলম।[৮]

লৌকিক জীবনে ননদ বৌদিতে ঝগড়া বিবাদ এক অতি প্রচলিত ঘটনা। এই ঝগড়া কি ভয়ানক রূপ ধারণ করে এবং কিভাবে সংসারে অশান্তি ডেকে আনে তার পরিচয়ও পাওয়া যায় লোকনাট্য আলকাপে। কাপ পালা ছড়ার মাধ্যমে লোকনাট্য শিল্পীরা তাঁদের বক্তব্য তুলে ধবে লোক সমাজকে শিক্ষিত কবে থাকেন। এইরকমই একটি কাপের বিবরণ দেওয়া হল—

দুঃখিনীর কাপ

দুঃখিনী বিধবা হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়িতে আছে। দুঃখিনীর ভাই ও বৌদি গল্প আলাপ করতে করতে বোনের প্রসঙ্গে আসে, পরদিন সকালে দুজনেই দুঃখিনীকে আনতে গেল। গিয়ে বোনকে রুক্ষ কেশ, ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দেখে। বোনকে এই অবস্থায় দেখে ভাই বোনকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। এবার বোনকে বাড়িতে এনে ভাই বৌকে রান্না করতে বলে বাজার গেল তরিতরকারি আনতে।

বোনের ক্ষিধে পেয়েছে, বৌদিকে বলছে, বৌদি আমাকে খেতে দাও না, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

বৌদি ঃ তুই কি বাড়ি থেকে খাই খাই করে এসেছিস। শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামীকে খেয়েও তোর পেট ভরেনি। আমাকেও খেতে এসেছিস? তুই আমার কাছে খেতে চাইবি না, চাইলে ঝাঁটার মুঠো দিয়ে মেরে বের করে দেব।

এই কথা শুনে দুঃখিনীর খুব কষ্ট হয়েছে। সেও বৌদির সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করছে। ঝগড়া হতে হতে বৌদি ননদকে মারধোর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। পথে যেতে যেতে দাদার সঙ্গে দেখা হয়। দুঃখিনী দাদাকে সব কথা খুলে বলে এবং দাদা তার বাজার করা সমস্ত জিনিস দিয়ে তাকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

ভাই বাড়ি গিয়ে তার বৌকে জিজ্ঞাসা করছে দুঃখিনী কোথায় গেল?

বৌ ঃ তোমার বোনকে বললাম আমার মাথাটা রুক্ষ হয়ে আছে, একটু দোকান থেকে তেল আনোতো। তোমার বোন শুনে রেগে গেল। আমিও রেগে গিয়ে বললাম তুমি ভাইয়ের বাড়ি এসেছ বলে বসে বসে খাবে? এই কথা শুনেই তোমার বোন চলে গেল।

স্বামী ঃ যাক তোমাদের বাড়িতে কি ঘটনা ঘটেছে শুনেছ?

বৌ ঃ কি হয়েছে?

স্বামী ঃ তোমাদের ঘর পুড়ে গেছে। তোমার বাবার টিকি পুড়ে গেছে। তোমার মায়ের মুখ পুড়ে হনুমুখী হয়ে গেছে। এখন ওরা গাছতলায় আছে। যদি কিছু খাবার থাকে দাও তাদের দিয়ে আসি। টাকা পয়সাও কিছু দেবে।

(বৌ শুনে কাঁদতে লাগল)

বৌ ঃ চারটে খুদ মা-বাবাকে দিয়ে এস।

স্বামী ঃ শ্বশুরবাড়িতে শুধু খুদ দিয়ে আসব টাকা পয়সা দাও।

বৌ ঃ টাকা পয়সা না থাকলে কি দিব? যাও তুমি খুদগুলোই দিয়ে এস।

ভেতরে টাকা পয়সা এবং উপরে খুদ দিয়ে ঘড়াটা স্বামীর মাথার উপরে তুলে দিল। সে ভাবল খুদ কটা যখন পেলাম তখন দুঃখিনী বোনকেই দিয়ে আসি। ভাই বোনের বাড়ি গেল।

ভাই ঃ দুঃখিনী দুঃখিনী বাড়িতে আছিস?

বোন ঃ কে দাদা? এস।

ভাই ঃ তোর জন্য কিছু খুদ নিয়ে এসেছি।

দুঃখিনী ঃ সে কি দাদা আমি তো খুদের ভাত প্রতিদিনই খাচ্ছি। তুমি চাল না নিয়ে খুদ নিয়ে এসেছ।

ভাই ঃ আরে বোন এটুকুই নিয়ে এসেছি বহু বুদ্ধি করে। তুই ঘবে রেখে দে।

(রাখতে গিয়ে খুদের ভিতরে কাঁচা টাকা দেখে। বোন চিৎকার করে দাদাকে বলছে —

বোন ঃ দেখ দেখ খুদের ভিতর কত কাঁচা টাকা।

(দাদা দেখে অবাক)

দাদা ঃ বোন এই খুদ টাকা তোর ভাগ্যে রয়েছে, তাই তোর ঘরে এনে দিলাম। তুই সুন্দর করে ঘর কর। তার পর তোর বৌদিকে দেখছি। আর কিছু দরকার হলে দিযে যাব। তবে আমি আর থাকছি না চললাম।

ভাই এসে তার বৌকে বলছে —

তোমাদের ঘর পুড়েনি।

বৌ ঃ তুমি কি করে বুঝলে?

স্বামী ঃ তোমার জেঠতুতো ভাই নির্মলের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। সে বলল কিছুই হয়নি। তাই মনে করলাম এই খুদ কয়টা বাড়ি বয়ে নিয়ে যাব। তাই রাস্তায় দুঃখিনীর বাড়িতেই দিয়ে এলাম।

বৌ ঃ কি বললে? খুদগুলো তোমার বোনকে দিয়ে চলে এলে? কিন্তু জানো? তুমি যাবার পর আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখেছি — ননদকে আমি মেরেছি বলে বড় পাপ হয়েছে। এই পাপের জন্য তোমার আমার সর্বনাশ হতে পারে। এই পাপ থেকে মুক্তি পেতে গেলে ননদ পুজো করতে হবে।

স্বামী ঃ তাই নাকি? তাহলে আমি কি করব?

বৌ ঃ তুমি তোমার বোনকে সম্মানের সঙ্গে নিয়ে আসবে।

ভাই চলল বোনকে আনতে। ভাই চিন্তা করল বোনকে নিয়ে গেলে তার বৌ তার বোনকে মারবে। তাই সে বোনকে না নিয়ে গিয়ে তার শাশুড়িকে আনতে গেল। শাশুড়িকে গিয়ে বলল—

মা, তোমাকে আমাদের বাড়ি যেতে হবে। আপনার মেয়ে খুব খারাপ। আজকে যদি আপনার পূজা না করি তাহলে আমি ও আপনার মেয়ে দুজনেই মারা যাব।

শাশুড়ি ঃ সে কি বাবা? তুমি আর আমার মেয়ে দুজনেই মারা যাবে?

জামাই ঃ আপনার মেয়ে ডেকেছে। দুপুরের আগেই আপনাকে যেতে হবে।

দুজনে পথে যাচ্ছে। পথে যেতে যেতে জামাই শাশুড়িকে বলছে —

আপনি মুখটি ঢেকে নিবেন আপনার মেয়ে যদি মুখ দেখতে পায় তাহলে পূজায় কাজ হবে না। আর আপনি কোন কথাও বলবেন না।

(বাড়ি গিয়ে)

স্বামী ঃ নিয়ে এসেছি।

বৌ ঃ তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? আরে এস এস, ঘরে চল তোমার পূজা হবে।

স্বামী ঃ পুজো তো করবে কিন্তু ঢাক ঢোলতো লাগিবে।

বৌ ঃ কোথাও যেতে হবে না। আমাদের বাড়িতেই যে ঢোলটা আছে তাতেই কাজ হয়ে যাবে।

স্বামী ঃ পুজো হবে কোথায়?

বৌ ঃ ঘরের ভিতরে।

স্বামী ঃ দরজা বন্ধ করে না খোলা রেখে?

বৌ ঃ না না ঘরের দরজা বন্ধ করে।

স্বামী ঃ তাহলে ঢোলকটা বাজাব কোথায়?

বৌ ঃ ঘরের বাইরে।

বৌ ঘরের ভিতরে তার ননদ ভেবে মুখ ঢাকা মাকে মারতে শুরু করল। মারের জ্বালা শেষ পর্যন্ত সইতে না পেরে মুখের কাপড় ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বৌ মা মা বলে চিৎকার করে উঠল। এরপর শাশুড়ি তার জামাইকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল। জামাই সমস্ত ঘটনা শুনাল। শাশুড়ি তাঁর মেয়েকে ভৎর্সনা করে তার ননদের সঙ্গে ভালভাবে চলার পরামর্শ দিল।[৯]

কাপটির মধ্যে বৌদি-ননদের ঝগড়াকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবং হিংসুক ব্যক্তির যে সর্বনাশ হয় তার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

লোক সমাজের দৃষ্টিতে বিবাহের পূর্বে নারী পুরুষ মেলামেশা দৃষ্টিকটু ব্যাপার। অবৈধ মেলামেশার ফলে সমাজের কি ক্ষতি হয তা ধরিয়ে দেন লোকনাট্য আলকাপের শিল্পীরা।

শিব হে কি বলিব কলির কথা লাজেতে মরি
বিয়ে না হওয়ার আগে ছেলেরা যায় শশুরবাড়ি।
প্রথমতে বলি আমি ছেলেদের তত্ত্ব

সব কথা বলিব আমি মিছে নাহি সত্য।
লেখাপড়ার নামে ছেলেরা শূন্য ফাঁকা ঢোল
ইংরেজী বাংলা লেকচারে বড় বড় বোল।
তার প্রেমিকা আসে যখন স্বর্গের অপ্সরী
পরনেত তার দেখি ধার করা রেশমী শাড়ি
মেয়ে এসে ছেলের কাছে দেয় গুড নাইট
ছেলে তখন ইংরেজীতে করতে লাগল ফাইট।
আই লাভ ইউ মাই ডিয়ার তুমি আমার বউ
রাগ করে থেকোনা প্রিয়ে হেসে কথা কউ।
বিয়ে না হওয়ার আগে হল অর্ধাঙ্গিনী
মিথ্যা প্রেমে পড়ে মেয়ে তারে বলে স্বামী।
এইভাবেতে কিছুদিন গত হয়ে গেল,
মেয়ের কোলে দেখুন একটি পুত্র সন্তান এল।
মেয়ে এসে ছেলের কাছে দেয় বিবরণ
ওগো তুমি বিয়ে আমায় করনা এখন।
ছেলে বলে হায়রে বিধি একি যে হল
ভেবে চিন্তে ছেলে তখন জয়বাংলা......দিল
ছেলে কোলে করে এখন সেই অবলা নারী
ধীরে ধীরে যায় মেয়ে পিতা-মাতার বাড়ি।
পাড়া প্রতিবেশী তারে দিলে যে গঞ্জনা
কেমন প্রেম করলি মেয়ে বিয়ে তো করল না।
গঞ্জনার ঠেলা সহিতে না পেরে
ধীরে ধীরে যায় মেয়ে রেল লাইনের ধারে।

রেল লাইনের ধারে গিয়ে কি কর্ম করিল
ছেলেটিকে শুইয়ে দিয়ে প্রাণে মারা গেল।
এসব কলিযুগের ঘটনা
মাস্টার নেহারুল দেয় বর্ণনা
কলিযুগের ঘটনা।[১৩]

ছড়াগানটিতে মিথ্যা প্রেমে পড়ে জনৈক নারীর কি সর্বনাশ হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে মিথ্যা প্রেম সম্পর্কে দর্শক সমাজকে দূরে থাকতে পরোক্ষভাবে শিক্ষা দিয়েছেন।

ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব করলে উভয়েরই যে ক্ষতি হয় তা কিন্তু আমরা ভুলে যাই। লোকনাট্য আলকাপ শিল্পীরা তাই আমাদের বাব বার মনে করিয়ে দেন তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে। তাঁরা কাপের মধ্যে হাসিঠাট্টা, তামাশা ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের বিষময় ফলটা কি হতে পারে দর্শক সমাজের কাছে আসরস্থ করেন।

কাপের নাম, 'সম্পত্তি বণ্টন' ঃ গল্পটি দুই ভাইয়ের পৃথগন্ন হওয়া নিয়ে। পৈতৃক সম্পত্তি বলতে দু-ঘরের একটি মাটির বাড়ি, একটি তালগাছ, একটা গাইগরু আর একটা..........। ছোটভাই খুব তেজী। গাঁয়ের মোড়ল ডেকে লম্ফ ঝম্প করে সে গানে সংলাপ বলতে থাকে —

বেঁটে দে দাদা ছাতা
বিষয়ের ভাগ নেবরে দাদা
ময়দা পেষণ জাঁতা।
বেঁটে দে দাদা হুঁকো
বিষয়ের ভাগ নেবরে দাদা
ছাগল বাঁধা খুঁটো।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পব ধূর্ত মোড়ল এভাবে বাঁটোয়ারা করে

দিল এভাবে ঘর যখন দুটো তখন হিসেব সোজা। তালগাছটার ভাগ হল গোড়ার দিকে আর ডগার দিকে। গাইগরুটার সামনের দিক আর পিছনের দিক। কাঁথাটা একজনের লাগবে দিনে অন্যজন রাতে। ছোট নিল তালগাছের গোড়ার দিক। কারণ তার বাবার অভ্যাস গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে তামাক খাওয়া। এবার সে লোককে বলবে পৈতৃক সম্পত্তিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকার চেয়ে সুখ আর নেই। সে গরুটার নিল সামনের দিক। কারণ সে মাঠে ঘাস কাটতে যাবে এবং সবাইকে বলার সুযোগ পাবে, গরুর জন্য ঘাস কাটতে এসেছে। (গ্রামের মানুষের কাছে এ একটা সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার)। কাঁথাটা সে দিনের দিকেই নিল। যে কাঁথা গায়ে ঘুরবে সবার সামনে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ পেয়েছে। লোকে কাঁথাটা দেখতে পাবে এবং প্রশংসা করবে।

এবার ক্লাইমেক্স। বড় ভাই বর্ষায় তাল বড়া খায়, তালের পিঠে খায় কারণ ডগার দিকটা তার। ছোট পস্তায়। গাইগরুর জন্য ছোটভাই ঘাস কেটে মরে, দুধটা পায় বড় ভাই। শীতের রাতে কাথা মুড়ি দিয়ে আরামে বড় তার বউকে নিয়ে ঘুমোয়। ছোট আর তার বউ ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপে।

ছোট ভাই বুদ্ধি খুঁজতে বের হল এবং মোড়লের কাছে বুদ্ধি পেয়েও গেল। তালগাছটার গোড়াটা যেহেতু তার তখন সে গোড়া কেটে ফেলতেই পারে। বড় তালগাছে উঠেছে পাতা কাটতে, সে ঘরের চালে ফুটো ঢাকবে। (তালগাছ হবে একজন লম্বা গড়নের দোহারকি) ছোট গোড়ায় কুড়ুলের কোপ বসাল। বড় ভাই-এর অবস্থা তখন করুণ।

তারপর বড় গাই দুইতে বসেছে। (একজন দোহারকি গরু হিসাবে হামা দিয়েছে।) ছোট গায়ের মুখের দিক গুঁতোতে শুরু করে আর গরু ঠ্যাঙ তুলে লাফায়। দুধ দোয়া গেল না।

এবার কাঁথাটা ছোটভাই দিনের বেলায় কাঁথাটা জলে চুবিয়ে রাখল। দিনে কাঁথাটার সে একচ্ছত্র মালিক সুতরাং সে যা খুশি তাই করতে পারে।

তার অজুহাত হল ছেলে রাতের বেলায় শুয়ে নোংরা করেছে। রাতে ভেজা কাঁথা দেখে বড়র চক্ষু চড়কগাছ। শেষ অবধি উভয়ে গিয়ে মোড়লের কাছে সমস্যার সমাধান করে নিয়ে নিজেরা মিলে মিশে চলার সিদ্ধান্ত নিল।[১১]

আবার মকবুল খলিফার দলের দ্বারা আসরস্থ ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ মুর্শিদাবাদ জেলার শামসেরগঞ্জ থানার অধীন কাকুড়িয়া মহেশতোলা গ্রামে দেখা এই কাপটি শুরু হয়েছিল আরেকটু আগে থেকে। ছোট এবং বড় ভাই দুজনে গিয়েছে মাটি কাটতে বাহির রাজ্যে। কিন্তু শরীর অসুস্থ হওয়ার জন্য বড় ভাই বাড়ি চলে আসে। এতে ছোট বউ-এর খুব দুঃখ। তার স্বামী নির্ধারিত সময়ের পর ফিরে এলে তার স্বামীকে নানাভাবে কূট পরামর্শ দিয়ে ভিন্ন হবার কথা বলে। তারপরেই শুরু হয় দুভায়ের সম্পত্তির লড়াই। পূর্বে বলা হয়েছে অন্যান্য লোকনাট্যের মত আলকাপের কোন কাপ, পালা বা কোন বিষয় প্রকরণী লিখিত থাকে না। তাই সময়, পরিবেশ ভিন্ন হেতু নিজেরাই রদবদল করে মানান সই করে নিতে পারে। আর এটাই লোকনাট্যের অন্যতম প্রাণশক্তির পরিচায়ক।

নারী পুরুষের দাম্পত্য জীবন যাপনের স্বীকৃতি হল বিবাহ অনুষ্ঠান। পল্লীজীবনে বাল্যবিবাহ এক অলিখিত সামাজিক স্বীকৃতি। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার কর্তৃক বাল্যবিবাহ রোধের জন্য এক আইন পাশ হয়। সেই আইনের প্রতিক্রিয়া লোকশিল্পী তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে কি হয়েছিল তা একটি ছড়া গানের মধ্যে পাওয়া যায়।

ভারতে খবর হল, গেজেট এল
পাশ হয়েছে সরকারি বিল,
বিহ্যা দেওয়া ভারী মুশকিল,
পঞ্চানন আর তারিনীবাবু এই আইন পাশ করাইল (দুবার)
হিন্দু-মুসলমানের মান এতদিনে বোধ হয় গেল হে।
ইহুদি পারসী যত জাতি

কাহারও নয় অব্যাহতি।
এই আইন সবার লাগি হবে,
বোধ হয় শেষে মুশকিল ঘটিবে।
১৮ বছর বালক আর ১৪ বছর বালিকা
বিবাহ দেবার আইন পাশ উঠেছে তালিকা। (দুবার)

এর কমে যে বিহ্যা দিবে
তার জরিমানা বড় হবে।
হুকুম হয়েছে রাজার
জরিমানা হবে এক হাজার।
আবার চেষ্টা করে এই আইনকে ভঙ্গ যে করিবে
আইন মোতাবেক দুনা সাজা তাকে নিতে হবে।
পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে তাকে
জরিমানা হবে হে,
একমাস হবে জেল বন্দী
তাতে নাই কোন ফন্দী
১৯৩০ সালের প্রথম এপ্রিলে (দুবার)
১৮ই চৈত্র মাসে ১৩৩৬ সালে
এই আইন হল জারি।
শুনতে পেয়ে লোকে তাড়াতাড়ি
জুড়লে বিহ্যা বাড়ি বাড়ি
দৌড়া যায় মহাজনের বাড়ি
আনতে কিছু টাকা কড়ি
তাও দিল না টাকা কড়ি

ধূলায় করি গড়াগড়ি
ফিরে চলে এলাম বাড়ি
বেচে ফেললাম বলদ গাড়ি
ঘটি বাটি আর বদনা কলসী
ভাত খাইবার বেচলাম থালি
বাঁশবাগান আমের বাগিচা
আর চৌকি ম্যাচা, দাউ
কুড়ালি হ্যাঁসা ক্যাইচা
লক্ষণ চেরাক বোতল গাছা
ঠাকুয়া তুলবার বেচলাম মাচা
গরু বকরী আর ভেড়ীর বাচ্চা
সীতা পাটিয়া নঙ্গ দানা
মাকড়ি বালি কানের সোনা
দাইমল কাটা কানের সুর
বেচে ফেললাম হাতের চুর
দাদারে তাও টাকা জুটল না
ছেলের বিহ্যাও হল না।
এই মামলাতে খুঁজ্যা মেলে না
ব্যারিস্টার আর উকিল
বলব কি আর ভাই দুঃখের কথা
বিহ্যা দেওয়া হয়েছে মুশকিল। [১২]

ছড়াটির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি আইন পাশ হবার কথা শুনে

কিরকমভাবে বিয়ে দেবার জন্য পল্লী সংসারে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। আবার অনেক আইন আদালতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ কিভাবে সর্বস্বান্ত হয়েছিল তারও মর্মবিদারী বিবরণ আলকাপ শিল্পীরা আলকাপ গানে দিয়ে থাকেন।

দেশের মধ্যে সাজাত্য বোধ জাগানো, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং মানুষে মানুষে মিথ্যা বিভেদ দূর করতে লোকশিল্পীরা সরব। তারা তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের কর্তব্যই কেবল পালন করেন না, সমাজের দিশারী হিসাবেও ভূমিকা পালন করেন। এরকম একটি ছড়া গান হল —

সোনার বাংলায় আমরা মানুষ কেন হলাম না
শস্যে ভরা জন্মভূমি মোদের অভাব কিছু রবে না
আমরা নয় গো হিন্দু নয় মুসলমান
জাতিতে সবাই যে সমান
শুধু ধর্মেতে হিন্দু মুসলিম গো
দেখুন খোদা-হরি একজনা
দূর করুন ভাই মনের হিংসা
অকাল মৃত্যুর এই যে নেশা
সবাই আপন আপন বেঁধে বাসা গো
ধর্মে কর্মে এগিয়ে চলুন না।
হিংসার জন্য কুরু বংশ
সমূলেতে হল গো ধ্বংস
ধর্মের জন্য ভগবান কৃষ্ণ গো
করেন পাণ্ডবের রথ চালনা।
সোনার বাংলায় আমরা মানুষ কেন হলাম না।

বলরে ভারতবাসী মন কেন আজ উচাটন।
হুজুগের বাতাস পেয়ে নিত্য ফিরে চাস নতুন।।
একবার উর্মি চাঁদের হুজুগ পেয়ে
এনেছিল নতুন দল
দুশ বছর ইঁদুর পুষে
কি লাভ তোরা করলি বল?
বারে বারে রদবদলে
কাজ কি হবে ঢোল মাদলে
কুয়াশার ঝড় বাদলে
অন্ধ করলি দুই নয়ন।
দেখ ব্রিটিশের গুলিতে যারা
বুক পেতে দিয়েছে প্রাণ
ঘরে ঘরে মারল তারা
বিদ্ধ করলে তোপ কামান।
তারা সর্বগ্রাসী জলধিতে
আজও পারে ডুবিয়ে দিতে,
সেদিন ভারতে উঠল পতাকা দিল্লীর দরবারে
ভেঙেছিল শিকল ভারতবাসী সিংহের পরাক্রম ধরে
ম্লানমুখে ছিল ভারত জননী কদিন জগৎ মাসে
ঘুচে গেল তার বন্ধন জ্বালা স্বাধীনের ভেরী বাজে।
মোগল পাঠান ইংরেজ জাতি হাজার বৎসর ধরি
করেছিল তারা ভারত শাসন সত্য স্বীকার করি।
শাসন করিয়া শোষণ করেছে দম্ভে পৌঁছেছে দেশ

কেঁদেছে আমার ভারতমাতা হয়নি কান্নার শেষ।
যেদিন ক্ষুদিরাম ফাঁসিতে যায় ভারতে পড়েছিল শোক
ভুলেনি ভুলেনি সেই মহাবীরও আজিও ভারতের লোক।।
যতীন্দ্রনাথ হলরে শহীদ দেখ ভাই দলে দলে
মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী গুলি খেয়ে প্রাণ দিলে।।
তারপর এল গান্ধীর যুগ আন্দোলন হল শুরু
বিশ্ব আন্দোলনে ব্রিটিশের বুক করে দুরু দুরু।
ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ মেরে পিটিয়ে দেশ শাসন করে
দলে দলে বীর বন্দী হয়ে যায় জেলখানার ঘরে।
সেই রক্তদানের সুখ-স্বাধীনতা ব্যর্থ যাতে না হয়
তাই ৫০ কোটি মায়ের সন্তান ভায়ে ভায়ে থাকা চায়।
আমরা গলে গলে মিশিব
স্বাধীনতার সুখ পাওয়া চাই ভাই
গলে গলে মিশিব। (দুবার)
আমরা হিংসা দ্বেষকে দূর করিব
দেশের কাজে এগিয়ে যাব
অধর্ম নইমুদ্দিনের এই মন্তব্য গো
ধর্মে কর্মে এগিয়ে চলুন না।
সোনার বাংলায় আমরা মানুষ কেন হলাম না।[১৩]

ছড়া গানটিতে স্বাধীনতা আন্দোলনে কিভাবে মানুষ হাসিমুখে প্রাণদান করে শহীদ হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া আছে এবং বহু কষ্টে পাওয়া এই স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য দেশবাসীর কাছে মিলেমিশে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

পল্লী জীবনের সাধারণ মানুষ অত্যাধুনিক আচার-আচরণ, পোশাক, পরিচ্ছদকে কোন দিনই ভাল চোখে দেখে না বা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা আধুনিকতার নামে এই বাড়াবাড়িকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ কটাক্ষের বাণে বিদ্ধ করেন। আলকাপ শিল্পীরা জনসাধারণের সচেতন প্রতিনিধি বা মুখপাত্র হিসাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন গান, ছড়া, কাপের মাধ্যমে। এমনি ধরনের একটি ছড়াগান —

দাদারে কি ফ্যাশান উঠিল দেশে স্যুট পরা
আবার চাইনিস শার্ট গায়ে দিয়ে
বাবুদের সামনের দিক গোটাই খাড়া
কি ফ্যাশান উঠেছে দ্যাশে স্যুটপরা।
বাবুরা রাস্তা দিয়ে যায়
জুতো মুজো দেখি পায়
সিগারেট খায় দেশালাই নাই।
আবার আগুনের প্রয়োজন হলে
করে হাতের ইশারা
কি ফ্যাশান উঠেছে দেশে স্যুটপরা।
বাবুরা সেলুনেতে যায় বলে নাপিত মহাশয়
উত্তমকুমার কিংবা দিলীপকুমারের ছাঁট আমার চাই।
আমার চুলের মেকাপ হোক বা না হোক
ঠিক থাকে যেন গোঁফ জোড়া।
কি ফ্যাশান উঠিল দেশে স্যুটপরা।।

আজকাল মেয়েরা সবাই সাজছে ববি

চলন ফিরন দেখে লাগে বিদেশী ছবি।

ওদের বয়স তিরিশ পেরিয়ে যাচ্ছে

তাও ছাড়ে না প্যান্ট ফ্রক পরা

কি ফ্যাশান উঠেছে দেশে স্যুটপরা।

মেয়েরা যারা শাড়ি পরতে চায়

টাইট বডি লাগায় গায়

পেট-কাটা বগল-কাটা ব্লাউজ দেখি গায়।

ওরা কুঁচি ধরে চলেছে দেখ

ঠিক যেন টাট্টু ঘোড়া

কি ফ্যাশান উঠেছে দেশে স্যুটপরা।

দেশে কিবা মজার কল

আবার জায়গায় জায়গায় সিনেমার হল

কার মেয়ে কার পাশে বসে করছে প্রেমের ছল।

আবার বই বা লাইন কেটে গেলে

অন্ধকারে কাজ সারা

কি ফ্যাশান উঠেছে দ্যাশে স্যুটপরা।[১৪]

ছড়াগানটিতে প্যান্ট স্যুট পরা, চুলের মেকাপ করা, সিগারেট খাওয়া, মেয়েদের আধুনিক বেশবাসকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। গানটির মধ্যে কোথাও কোথাও স্থূল রসের পরিচয় আছে। তা কিন্তু পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিতে ও দর্শক সাধারণের কাছে অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ নয়। দর্শক সাধারণের মনের

মধ্যে অত্যাধুনিক বেশবাস বা বিচরণ সম্পর্কে ঘৃণাবোধ জাগাবার উদ্দেশ্যেই আলকাপ শিল্পীরা এই ধরনের গান তাৎক্ষণিকভাবে রচনা করে আসরে পরিবেশন করেন।

এইভাবে লোকনাট্য আলকাপ জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য বা শিক্ষিত করে তোলার জন্য জনসংযোগ মাধ্যম হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই লোকশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে লোকনাট্য আলকাপকে অন্যতম প্রধান লোকশিল্পীদের লোকশিক্ষক বলাই শ্রেয়। কিন্তু নগর সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে, ব্যবসায়িক সাফল্যের পশ্চাতে ছোটার প্রয়াসে আজ তার ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা বহু শিল্পী ভুলতে বসেছেন। তবু এখনও বেশ কিছু আলকাপ দল বা শিল্পী আছেন যারা নিজস্ব ঐতিহ্যকে ধরে রাখার অভিপ্রায়ে প্রতিনিয়ত সংগ্রামরত।

উৎসপঞ্জি

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ বৈতালিক উপন্যাস, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলী, পৃঃ ৪৭১

২. বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার পাকুড় যাত্রার অন্তর্গত ইলামী গ্রাম নিবাসী আলকাপের প্রখ্যাত খলিফা পঙ্কজ ভূষণ দাসের নিকট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৩. বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার নারায়ণপুর গ্রামের আলকাপ গানের ছড়াদার মহঃ হারেজ শেখের নিকট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৪. মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত সুজাপুর-বামন গ্রামের আলকাপ শিল্পী ওস্তাদ আবুল কাশেমের নিকট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৫. মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা থানার বল্লাপুর লহড্যা গ্রামের প্রবীণ শিল্পী আনিসুর রহমানের নিকট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৬. বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার অধীন পাকুড় যাত্রার অন্তর্গত ইলামী গ্রামের প্রবীণ শিল্পী হরেরাম সরকারের নিকট থেকে সংগৃহীত।

৭. উপরিউক্ত গ্রাম নিবাসী শিল্পী অনাথবন্ধু দাসের নিকট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৮. বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার পাকুড় থানার সীতামারি গ্রাম নিবাসী ওস্তাদ ফুলচাঁদ সরকারের নিকট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৯. মুর্শিদাবাদ জেলার সমসেরগঞ্জ থানার অধীন দোগাছি নিবাসী প্রখ্যাত আলকাপ শিল্পী শ্যামচাঁদ দাসের নিকট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

১০. মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত রাজনগর কলোনির বাসিন্দা আলকাপ শিল্পী মাস্টার নেহারুল ইসলামের কাছ থেকে কালিয়াচক মথুরাপুর এলাকার অমৃতি গ্রামের গানের আসরে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

১১. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 'দেশ' পত্রিকা, ৪৯ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ৪ ভাদ্র, ১৩৮৯।

১২ বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার রাজমহল থানার গোবিন্দপুর খিদুটোলা নিবাসী প্রবীণ শিল্পী মকবুল খলিফার নিকট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

১৩. শিল্পী নইমুদ্দিন শেখ, সাগরদীঘি, কৃষ্ণপুর, মুর্শিদাবাদ, 'মুর্শিদাবাদ চর্চা', সম্পাদক ঃ প্রতিভারঞ্জন মৈত্র। পৃঃ ৩১

১৪. শিল্পী হারেজ শেখের নিকট থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার অধীন ভবানীবাটি গানের আলকাপের আসর থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

নবম অধ্যায়

পরিবর্তনশীল সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে আলকাপ

লোকনাট্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। লোকনাট্য বলতে আমরা এমনই এক গীতাভিনয় বা নাট্য আঙ্গিককে বুঝি যার রচয়িতা দর্শক বা শ্রোতা, পাত্র-পাত্রী, বাদ্যযন্ত্রী সকলেই পল্লীর সাধারণ নিরক্ষর বা সামান্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকসমাজ। তাই লোকনাট্য সমাজ নিরপেক্ষ নয়। সমাজের দুঃখ দুর্দশা, দুর্ভিক্ষ বা মহামারী, শোষণ নিপীড়ন, জ্বালাযন্ত্রণা, হাসি-কান্না ইত্যাদিরই জীবনালেখ্য হল লোকনাট্য। আলকাপ লোকনাট্যে হাসি ঠাট্টা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ বা টিপ্পনীর মাধ্যমে সমাজ মননের বিচ্ছুরণ ঘটে। তাই আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলকাপের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকেরও পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। পরিবর্তনশীল সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন বিষয়কে অবলম্বন করে আলকাপ তার নিজের প্রাণশক্তিতে সজীব হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে আলকাপ গানের মাধ্যমে দেশের মানুষকে ইংরেজদের শোষণ নিপীড়ন বা নির্যাতনের বিরুদ্ধে সজাগ করা হত। তার পরিচয় আমরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আলকাপ গানের উপর ভিত্তি করে রচিত 'বৈতালিক' উপন্যাসে পাই। এমনকি শ্রী হরেরাম সরকার, মহঃ কলিমুদ্দিন, রমাকান্ত দাস, মকবুল খলিফা প্রমুখের কাছেও এই ধরনের

নিদর্শনমূলক ছড়া বা কাপ পাওয়া গেছে। 'বৈতালিক' উপন্যাসে ৪৯৫ পৃষ্ঠায় একটি গানে ব্রিটিশদের স্নেহপুষ্ট মহাজন জমিদার ও দারোগার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে -- 'ঐ তিনটা শালাকে মারিখা দ্যাও ঘুচুক এ জঞ্জাল / আর কতকাল সহিবা ভাই দ্যাশের পোড়া হাল।' গানটির মাধ্যমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সশস্ত্র বিদ্রোহ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ভারতবাসী স্বাধীনতা পেল কিন্তু দেশভাগের মাধ্যমে। ইংরেজরা দেশ ছেড়ে যাবার সময় দেশটাকে দুটুকরো করে গেল। যার অনিবার্য পরিণতি ঘটল ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িকতার উন্মাদনায় ভাই -এর বুকে ভাই ছুরি বসায়, হাত হল রক্তাক্ত। লোক কবিরা গর্জে উঠলেন গানের মাধ্যমে, মানুষকে সজাগ করে মিলনসূত্রে আবদ্ধ হবার উদাত্ত আহ্বান জানালেন —

চিন্তা করে দেখ মনে হিন্দু মুসলমান
এক মাতার সন্তান ওগো মোরা দুটি প্রাণ।
যাকে বলে খোদা তালা তাকেই বলে হরি
তবে কেন ভায়ে ভায়ে করি মাবামারি।[১]

স্বাধীনতা এসেছিল বহু রক্তের বিনিময়ে, বহু মানুষ উত্তরসূরীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের স্বপ্ন নিয়ে রক্ত দিয়েছিলেন। দেশবাসীও ভেবেছিলেন স্বাধীন হবার পর তাদের দুঃখ-দুর্দশার লাঘব হবে। কিন্তু তাঁদের আশা যখন নিরাশায় পরিণত হল, তাদের রঙীন স্বপ্নজাল যখন স্বার্থপর দেশের কর্ণধারদের অনুসৃত নীতির বাস্তব আঘাতে হল ছিন্ন ভিন্ন, তখন তারা দেশ নেতাদের বিরুদ্ধে ধিক্কারে সোচ্চার হলেন। প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠস্বরূপ আলকাপ শিল্পীরাও বাঁধলেন গান —

দেশের নেতা গো পল্লীবাসীর বুকের দরদ বুঝল না
আমার বুকে রক্তে তপ্ত মাটি গো
আমি বেঁচেও দেখো বাঁচলাম না
দিনে দিনে আহার বিনে চক্ষে দেখি অন্ধকার

হাতে কাস্তে কোদাল লাঙল মিথ্যা ফসল বোনা
পরের গোলা বোঝাই করি ঘরে নাইকো দানা
তোমরা মুখের ঘাম মোছো গো দামি তয়লাতে
আমরা চোখের জল মুছি হায় ছেঁড়া চটের থলেতে।
তোমরা মোটর গাড়ি চড় আমরা চাপা পড়ি
খুঁজে দেখ কলের ক্ষতি নেমে তাড়াতাড়ি
বণিক রাজার এমন বিধান
শোষণ শাসন আর অপমান
মনের দুঃখে মুখ বুঝে
সইতে হচ্ছে বুঝে সুঝে
আমার স্বাধীনতার লেগে
কতদিন রাত্রি জেগে গো
বুকের রক্ত দিলাম তুলি
সে কথা যাইনি ভুলি
ওস্তাদ সিরাজ ভেবে বলে
গাঁয়ের গরীব আজ সকলে
গরীব চাষি মজুর ভাই
জোট বাঁধো তোমরা সবাই।
অপমানের জবাব দেব
শোষণ শাসন আর সইব না।
আমার বুকের রক্ত তপ্ত মাটি গো
আমি বেঁচেও দেখ বাঁচলাম না
দেশের নেতা গো পল্লীবাসীর বুকের দরদ বুঝল না।[২]

গানটিতে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশের ধনী দরিদ্রের ব্যবধান কিভাবে বেড়েছে এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা জানিয়ে দেশের নেতার কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। লোকশিল্পী সিরাজ সাহেব কেবল সেখানেই থেমে যাননি তার প্রতিকার বিধানের উদ্দেশ্যে দেশের মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিয়েছেন।

হুগলি নদীর মোহনায় পলি জমে যাবার জন্য বড় বড় জাহাজ কলকাতা বন্দরে আসতে পারে না। ড্রেজার দিয়ে পলি কাটতে বছরে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। তাই কলকাতা বন্দরকে বাঁচানোর জন্য ফরাক্কায় দেওয়া হল বাঁধ এবং ফরাক্কা থেকে বল্লালপুর, চাঁদপুর, আমহুয়া, হাজিরপুর, আহিরন হয়ে সুদীর্ঘ এক ক্যানেল কেটে জল-প্রবাহকে জঙ্গীপুরে ভাগীরথী নদীতে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু এই ফিডার ক্যানেলের অগভীরতার জন্য ক্যানেলের পশ্চিম বা দক্ষিণ দিক থেকে আসা পাহাড়ের জলধারায় কৃষকদের জমিজমা, ফসল সবসময় ডুবিয়ে নষ্ট করে দেয়। চাষিদের এই বেদনাকে সুর দিয়েছিলেন আলকাপের লোকনাট্য শিল্পীরা --

এই যে কোন্ শয়তানে ফরাক্কা করে
তারা কোম্পানীতে জমি কেটে সব নদী করে
পার্টিরা সব যুক্তি করে জুড়ে দিল চাষি মারা কল
মাটি কাটা কল নয় দাদা চাষি মারা কল।

সামাজিক বিভিন্ন সমস্যাকে অবলম্বন করে গান কাপ রচনা করে প্রতিবিধান করার যে আলকাপের লোকশিল্পীরা চেষ্টা করেন তার বিভিন্ন পরিচয় পূর্বের অধ্যায়েই আলোচনা হয়েছে। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, বহুবিবাহ, কুসংস্কার, বর্ণবিদ্বেষ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যার উপর গান বা কাপ বেঁধে আলকাপের শিল্পীরা জনসমাজ বা জনজীবনের সঙ্গে একাত্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

বর্তমান সমাজে নিরক্ষরতা হল এক বড় ধরনের অভিশাপ। ১৯৫২ সালে ভারতে সাক্ষরতার হার ছিল ১৬.৬, ১৯৭১ সালে তা বেড়ে

দাঁড়িয়েছে ২৯.৬-এ। কিন্তু সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার গ্রামের তুলনায় শহরাঞ্চলেই বেশি। ১৯৮১ সালের আদমসুমারিতে জানা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হার মাত্র ৩৩ শতাংশের কাছাকাছি এবং মহিলাদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার আরো ভয়াবহ। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কিছু কিছু নৈশ বিদ্যালয় হয়। বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে লোকশিল্পীরাও তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেন। তাঁরা গান, ছড়া, কাপ ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণকে সাক্ষরতার আন্দোলনে এগিয়ে আসতে উৎসাহী করে তোলেন।

বিধি হায় কি করিলাম
কেন আমি মেম্বার হলাম
মাটি কাটা কাম ছিল ভাল
মেম্বার হইয়া মরিলাম... ......।
লেখাপড়া না শিখিলে কেমন হয় হে
তাহার মত আহাম্মক দুনিয়ায় নাই হে।
কাগজকলমের কাজ লাগিলে
টিপ দিতে হয় বুড়ো আঙুলে
এ বড় লজ্জার কথা
কিসে ভাঙিব মাথা।[৪]

গানটিতে আত্মগ্লানি বা আত্মধিক্কারের মধ্য দিয়ে নিরক্ষরতার বিপদ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে 'আহাম্মক' শব্দের অর্থ হল মস্ত পাগল। শব্দটির মধ্য দিয়ে নিরক্ষরতার অভিশাপকে প্রকটভাবে দেখানো হয়েছে।

শিক্ষিত হলে কি উপকার হয়, জীবন কিভাবে সুখময় হয় তার কথাও আলকাপ গানে সুর পাই।

আহা কি মজারে

বাবা কি মজারে

লেখাপড়া শিখিলে

মনের আঁধার যাবে চলে

জ্ঞানের বাতি জ্বাইলে লে

বিদ্যাতে বিজ্ঞানী হয়

কি আনন্দ এ দুনিয়ায়

কলে নাচে কলে কুঁদে

কলেতে কথা বলে

বাহ! কি মজারে।[৫]

তাই বোঝা যাচ্ছে আলকাপ কেবলমাত্র হাস্য পরিহাসেরই আঙ্গিক নয়। আলকাপ গানের মধ্যে সূক্ষ্ম সমাজভাবনাও যে প্রকাশ পায় তা গানটি প্রমাণ করে।

শুধু গান বাঁধার মধ্যেই নয়, আলকাপ শিল্পীরা নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কাপও তৈরি করেছেন। ১৯৮৬ সালের মে মাসে মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা থানার কুলী গ্রামে দেখা এই ধরনের একটি কাপের সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

হারাধনের সংসারে তিনজন। তারা স্বামী স্ত্রী এবং একখান পুত্র সন্তান গোপাল। পুত্র গোপালকে কেন্দ্র করে তাদের অনেক স্বপ্ন। তারা নিজে নিরক্ষর হলেও তাদের একমাত্র সন্তানকে ভালভাবে লেখাপড়া শেখাতে চায়।

গোপাল একসময় কঠিন অসুস্থ হয়ে পড়ে। হারাধন একমাত্র সন্তানকে বাঁচাবার অভিপ্রায়ে শহর থেকে ডাক্তার ডেকে আনেন। ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশন দেখে ওষুধ নিয়ে আসে হারাধন। হারাধনের বাড়িতে কীটনাশক ওষুধও ছিল জমিতে দেবার জন্য। হারাধনের স্ত্রী লক্ষ্মী ওষুধ

ভেবে ছেলেকে সেই কীটনাশক ওষুধ খাইয়ে দেয়। ছেলে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মারা যায়। হারাধন বাড়িতে ফিরে আসে এবং শুরু হয় স্বামী-স্ত্রীর আকাশ ফাটানো কান্নার রোল।

নিরক্ষরতা মানুষের জীবনে কি বিপর্যয় ডেকে আনতে পাবে সেই বিষয়ে সজাগ করাব উদ্দেশ্যেই কাপটি রচিত।

বর্তমান সমাজে আরেকটি বড় সমস্যা হল পণপ্রথা। প্রতিদিন পত্রিকা খুললেই আমরা দেখতে পাব বধূ বিতাড়ন, বধূ নিপীড়ন বা বধূনিধন। এর মূল কারণ পণপ্রথা। পণপ্রথা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বহু নারীরই অবস্থা আজ 'দেনাপাওনার' নিরুপমা বা দেবযানী বণিকদের মত। এই সমস্যার ব্যাপারেও পল্লীর লোকশিল্পীরা উদাসীন নন। লোকনাট্য আলকাপ শিল্পীরা এই সমস্যাটির কথা শুধু গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তাই করেন না, তারা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করাব জন্য গণ সংযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করেন। পণ প্রথার সমস্যা নিয়ে বচিত কাপের মধ্যে অন্যতম হল 'সাইকেল ঘড়ির কাপ'।

ছেলের নাম পটল। তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হতেই সে তার স্ত্রীকে বলে, 'বর্তমান যুগে বিয়ের সময় পাত্রী পক্ষ থেকে পাত্রকে সাইকেল ঘড়ি দেওয়া হচ্ছে। তুই এইগুলি বাপের বাড়ি থেকে না নিয়ে এলে আমি তোকে বাড়িতে রাখব না'।

কথা কাটাকাটি হতেই পটল তার স্ত্রীকে মারধোর করে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। পটলের স্ত্রী তার দাদাকে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে সব কথা বলে। তারা দাদারা দুভাই। তাদের মধ্যে এক ভাইয়ের নাম ভেজালি। সে প্রতিজ্ঞা করে যে তার ভগিনীপতিকে সে এর জন্য শাস্তি দিবেই।

সে পটলকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে নিয়ে আসে। তার কাছে জামা-প্যান্টের মাপ নেবার ভান করে তাকে দড়িতে বাঁধে এবং সামান্য মারধোরও করে। তারপর আরো বেশি শাস্তি দেবার জন্য তাকে মাঠে নিয়ে গিয়ে এক গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে। তারপর সে বাড়ি যায় দুপুরের খাবার খেতে।

এদিকে এক গোয়ালা গরু চরিয়ে দুপুরে বিশ্রাম নিতে সেই গাছতলায় হাজির। সে পটলকে তার এই অবস্থার কারণ জানাতে চায়।

পটল নিজে মুক্ত হবার জন্য ছল করে বলে যে তার সঙ্গে রাজার মেয়ের বিয়ে দেবে। কিন্তু সে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায় না। তাই তাকে এভাবে বেঁধে রেখেছে। গোয়ালার কিন্তু বিয়ে হয়নি। সে পটলকে অনুরোধ করে তার সঙ্গে যেন রাজার মেয়ের বিয়েটা হয়ে যায়।

পটল তৎক্ষণাৎ নিজে মুক্ত হয়ে গোয়ালাকে সেই গাছের সঙ্গে বেঁধে দেয় এবং তার মুখ দেখে যাতে চিনতে না পারে মুখটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় এবং তাকে বলে যে, সে যেন কিছুতেই কোন শব্দ না করে বা মুখটা না খোলে।

কিছুক্ষণ পর ভেজালি এসে আবার শুরু করে মারধোর কিন্তু গোয়ালা রাজকন্যেকে বিয়ের লোভে মুখ আর খোলে না। পটলের স্ত্রী পারুলের মন কিন্তু অন্যরকম হয়ে গেছে। তার স্বামীর উপব যত রাগ মুছে গিয়ে তার প্রতি তার ভালবাসা জেগে উঠেছে। তাছাড়া তার স্বামী মারা গেলে তাকে তো বৈধব্যজীবন যাপন করতে হবে। তাই সে তার দাদাকে পায়ে ধরে অনুরোধ করে সে যেন তার স্বামীকে আর না মারে। পারুল বলে সে তার স্বামীকে মানিয়ে নেবে। তখন সুযোগ বুঝে গোয়ালা মুখের কাপড় খুলে পারুলকে জড়িয়ে দেখে। পারুল দেখে যে এটা তার স্বামী নয়। তাই সে ছুটে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু গোয়ালাও নারাজ। শেষ পর্যন্ত পটল আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পারুলকে মুক্ত করে আর সে নিজেও শপথ নেয় আর কোনদিন সে তার বউকে সাইকেল, ঘড়ির জন্য নির্যাতন করবে না এবং গোয়ালাও প্রতিজ্ঞা করে পরের সম্পদে কোনদিন প্রলুব্ধ হবে না।[৭]

কাপটিতে এভাবে হাসি ঠাট্টা ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্য দিয়ে পণপ্রথার ভয়াবহ পরিণাম দেখানো হয়েছে। জনসাধারণকে তারা জানিয়ে দিয়েছে পণ চাইতে গেলে বা পণের প্রতি লোভ করতে গেলে এই ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হয়। পাশাপাশি পণের জন্য যে নারীটিব উপর নির্যাতন চালায় সে তার কতটা শুভাকাঙ্ক্ষী তাও এই কাপে দেখা যায়।

আলকাপ গান কলকাতার চিৎপুরী যাত্রা, সিনেমা, ভি ডি ও-এর প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। অনেকে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভের আশায় ঐ মাধ্যমগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে নগর সংস্কৃতির নোংরা বেনেজলকে আলকাপে এনেছেন। আলকাপ থেকে 'পঞ্চরস আলকাপ' তারপর 'পঞ্চরস অপেরা' বা শুধু 'অপেরা' শব্দটি ব্যবহার করে আলকাপের সঙ্গে তাদের যোগসূত্রটি ছিন্ন করতে চাইছেন। অপরদিকে লক্ষ্য করি পরিবর্তনশীল সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে আলকাপ গান শ্রেণী দ্বন্দ্ব, জোতদার মহাজনের জুলুমের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াই-এর কথাও প্রাধান্য পাচ্ছে। যেমন —

আমরা গরীব পাইনা খেতে
থাকি ভাঙা ঘরে
ধনীরা ভাত দেয়গো ফেলে
খায়না তাদের কুকুরে।
আমরা কাঙাল বলে
পাপ করেছি বিশ্ব চরাচরে
কেউ থাকে ভাই সাতমহলায়
কেউ ঘুমিয়ে থাকে ড্রেনের তলায়
ধনীরা হাসে বসে আমরা যখন যাই দুয়ারে।[৮]

এইভাবে পরিবর্তনশীল সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী বৈষম্যের কথা আলকাপ গানের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আরেকটি বড় ধরনের সমস্যা হল দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। একটা সংসারে অধিক সন্তান হলে কি দুঃখ-দুর্দশা হয় সে বিষয়েও আলকাপ শিল্পীরা পালা বেঁধেছেন। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ মুর্শিদাবাদ জেলার সুতী থানার শঙ্করপুর গ্রামে এই ধরনেরই একটি পালা চোখে পড়ে। পালাটি পরিবার পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে রচিত।

পালাটিতে উচ্চ শিক্ষিতা এক কন্যার পাত্র দেখার জন্য তার পিতা আসেন এক বাড়িতে। সেখানে এসে দেখেন আট দশ ভায়ের লঙ্কাকাণ্ড শুরু হয়েছে এবং তাদের ঝগড়া মেটাতে গিয়ে পাত্রীর পিতাও কিছুটা নিগৃহীত হন। এতে কন্যার পিতা গেলেন ভীষণ চটে। পাত্র পক্ষের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর সেখানে থাকলেন না। অর্থাৎ অধিক সন্তানের কি পরিণাম তা এই কাপটিতে দেখানো হয়েছে।

১৯৯৭-এর মে মাস নাগাদ মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জ থানার কাঁকুড়িয়া মোড়ে কাশিমের হাটে পরিবার পরিকল্পনার উপর আলকাপের গান শোনা গিয়েছিল নৈমুদ্দিনের দলের থেকে। শতপুত্রের পিতা ধৃতরাষ্ট্র, পাঁচপুত্রের পিতা পাণ্ডবের রীতিমত বোল কাটাকাটির লড়াই। শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের জয় হয়। অর্থাৎ পরিবার পরিকল্পনার সাফল্য সেখানে দেখা হল।

বিগত ২০ বছরে গ্রামবাংলার উন্নয়নে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে চলেছে। বর্তমানে কোন কোন আলকাপ দলে পঞ্চায়েতের বিষয়েও গানে বা কাপে প্রাধান্য পাচ্ছে। আলকাপ শিল্পী ছড়া গানে বলছেন —

এসেছে পঞ্চায়েত
গড়ব মোদের দেশ
কাজ পাব বার মাস
দুঃখ রবে না।[১]

শুধু পঞ্চায়েতই নয় অপারেশন বর্গা, ভূমি সংস্কার, বেকার সমস্যা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করেও আলকাপের গান বা কাপ আসরে পরিবেশিত হচ্ছে। এ থেকেই বোঝা যায় আলকাপ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সজীব বা প্রাণবন্ত রাখার জন্য নতুন নতুন বিষয়কে অবলম্বন করে ছড়া গান রচনা করছেন।

উৎসপঞ্জি

১. ওস্তাদ ঝাঁকসু ঃ মুর্শিদাবাদ চর্চা, সম্পাদক — প্রতিভা রঞ্জন মৈত্র। পৃঃ ২০০

২. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। ঐ। পৃঃ ২০১। অনুরূপ গান মালদা জেলার মানিকচক থানাব অধীন বহিমপুর নাকিটোলা নিবাসী মাস্টার কলিমুদ্দিন শেখের মুখে লেখক শুনেছিলেন।

৩. মুর্শিদাবাদ জেলার সুতী থানার অন্তর্গত চাঁদের মোড়ের এককালের আলকাপ শিল্পী চা দোকানী চাঁদ মহম্মদের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৪. সংগ্রাহক পুষ্পজিৎ রায়, লৌকিক সৃজনী, সম্পাদক — সুবোধ চৌধুরী, মানিকচক, মালদা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ৮৫ সংখ্যা, পৃঃ ৩৯।

৫. ঐ

৬. বাদল 'পঞ্চরস অপেরা' কর্তৃক মুর্শিদাবাদ জেলার বাসুদেবপুরে আসরস্থ লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৭. মালদা জেলার কালিয়াচক থানার ভগবানপুর নিবাসী আলকাপ শিল্পী নবেদ আলি খলিফার কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৮. মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার সুন্দরপুর গ্রাম নিবাসী প্রখ্যাত সঙাল করুণাকান্ত হাজরার নিকট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৯. মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা থানার বল্লারপুর লহড়্যা গ্রামের আনিসুর রহমান খলিফার কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

দশম অধ্যায়

অন্যান্য লোকনাট্য ও আলকাপ

বাংলার লোকনাট্য ধারায় আলকাপ সহ যে সকল লোকনাট্য উল্লেখযোগ্য তা হল গম্ভীরা ডোমনি, খন, বিষহারা, কুষাণ, ব-খেলা, পালাটিয়া, বোলবাহী, লেটো, মাছানি, কৃষ্ণযানা, চোরচুন্নি, পুতুল নাচ, কালাপাহাড়, বনবিবি, ছৌ, ধানগান ইত্যাদি। তাছাড়া কলকাতার যাত্রাকেও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য রীতিসম্মত বা সাহিত্যিক লোকনাট্য অভিধায় অভিহিত করেছেন। তার কারণ, "ইহা সাধারণত অশিক্ষিত জনসাধারণকে আনন্দ দিবার এবং আনন্দের মাধ্যমে জনমানসে মূল্যবান সামাজিক আবেগ সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যে মুখ্যত রচিত ও অভিনীত হয় ...। এই শৈল্পিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে গিয়া যেমন যাত্রা নাটকের জন্য সার্বজনীন আবেগপূর্ণ বিষয়বস্তু বা ঘটনা নির্বাচন করতে হয়, তেমনি সহজ সরল সর্বজনবোধ্য ভাষায় সংলাপ রচনা এবং আবেগ সঞ্চারক কতগুলি রীতি প্রয়োগ করিতে হয়...। খাঁটি মহাকাব্যের মত খাঁটি লোকনাট্য স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি। অন্যপক্ষে সাহিত্যিক মহাকাব্যের মত সাহিত্যিক লোকনাট্য শিক্ষিত বা শিক্ষিতকল্প নাট্যকারের পরিকল্পনা প্রসূত অর্থাৎ লোক উপভোগ্য এবং আসরে অভিনয় নাটক লেখার উদ্দেশ্য লইয়া চেষ্টাকৃত রচনা। খাঁটি লোকনাট্যের অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা এই শ্রেণীর লোকনাট্যে পাওয়া যায় না।"[১]

কিন্তু আধুনিক যাত্রা বর্তমানে সিনেমা ও থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করতে গিয়ে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করলেও লোকনাট্যের সীমারেখা বহুলাংশে অতিক্রম করেছে। আলোকসম্পাত, যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রয়োগ, আবহ সঙ্গীত ব্যবহার, অভিনয়ে সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি, দৃশ্যপটের ব্যবহার, পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক পালার পরিবর্তে সামাজিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বমুখর পালা রচনা ইত্যাদি আধুনিক যাত্রার বৈশিষ্ট্যতাকে লোকনাট্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

প্রধান প্রধান লোকনাট্যগুলির সঙ্গে লোকনাট্য আলকাপের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বাংলার লোকনাট্য ধারায় আলকাপের স্থান নিরূপিত হতে পারে।

গম্ভীরা ও আলকাপ

মালদহ ও রাজশাহী জেলায় আলকাপের পাশাপাশি লোকনাট্য গম্ভীরা বিদ্যমান। কারো মতে আলকাপ হল শিব বিষয়ক গম্ভীরা গানের ইসলামী সংস্করণ এবং এটি কেবলমাত্র মুসলিম সমাজেই প্রচলিত। উভয়েরই মতে আলকাপ শব্দটি আরবী শব্দজাত। কিন্তু আলকাপ বলে আরবী কোন শব্দ নেই, আছে আলিফ কাফ — এরা উভয়েই বর্ণ মাত্র শব্দ নয়। আলকাপ শব্দটি মিশ্র শব্দ। 'আল' হল দেশী শব্দ যার অর্থ হল হুল বা কন্টক। (এ বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্য প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে।) কাপ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত কাপট্য থেকে যার অর্থ ব্যঙ্গকারী তামাসা বা সঙ। আমরা শব্দটি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল-এ পাই —

কেহ বলে ঐ এল শিববুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়ীটি খেলাও দেখি সাপ।।

আলকাপ যে গম্ভীরার মুসলিম সংস্করণ নয় তার প্রমাণ পাই আলকাপ গানের শিব-পার্বতী, সরস্বতী, কালী-বন্দনায়। আলকাপ দলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই শিল্পী থাকেন। আলকাপের স্রষ্টা বলে যার নাম আলকাপের শিল্পী মহলে অবিদিত তিনি হলেন বনমালী সরকার ওরফে বোকাকানা, ধর্মে হিন্দু। তাছাড়া আলকাপ গানের মধ্যে যে বোধটি সব

থেকে বেশি রেখাপাত করে তা হল সর্বধর্মের সর্ববর্ণের মানুষের মিলন, মৈত্রী বা সৌভ্রাতৃত্বের সুর। হরিপদ চক্রবর্তী গম্ভীরা ও আলকাপের তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন অন্তরঙ্গ দিকে এ দুটির চরিত্র-আলাদা গম্ভীরা স্পিরিচুয়ালিস্টিক আর আলকাপ সেকুলার।[৫]

গম্ভীরার প্রাচীন আঙ্গিক চাবটি—শিববন্দনা, চার ইয়ারী, টপ্পা-ঠুংরী ও সালতামামী বা রিপোর্ট। বিংশ শতকের প্রথম দিকে সুফী মাস্টারের প্রচেষ্টায় বোকাকানার আলকাপের রমরমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীরা গানে পালা গান রূপ পঞ্চম অঙ্গটি যুক্ত হয়।[৬]

বর্তমানে গম্ভীরার যেমন পাঁচটি আঙ্গিক তেমনি আলকাপেরও পাঁচটি আঙ্গিক, আসর বন্দনা, বৈঠকি, কাপ, ছড়া ও পালাগান।

গম্ভীরা গানে শিব ছাড়া অন্য কোন দেবতার বন্দনা থাকে না কিন্তু আলকাপে শিব ছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনা গান গাওয়া হয় আসর বন্দনা অংশে। দানেস খলিফার দলের গানে কোথাও কোথাও আসর বন্দনা অংশে দেব-দেবী বন্দনার পরিবর্তে আলকাপের কুশীলবরা জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে মাথায় টুপি পরে দেশবন্দনা গেয়ে থাকে।

গম্ভীরা গান সাধারণত গম্ভীরা উৎসব উপলক্ষ্যে গীত হয়, কিন্তু আলকাপ গানের নির্দিষ্ট কোন উপলক্ষ্য নেই, বছরের যে কোন সময় হতে পারে। তবে প্রাকৃতিক হাওয়া অনুকূলের দিকে লক্ষ্য রেখে সাধারণত আশ্বিন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত আলকাপ গানের অনুষ্ঠান বেশি হয়। আলকাপ গান বহুক্ষেত্রে জুয়াড়ীরা জুয়ার মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে আলকাপ গানের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু গম্ভীরা গানের ক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা যায় না। মালদহ রাজশাহী জেলায় যখন গম্ভীরা উৎসব হয় তখন প্রতিটি গ্রামেরই গম্ভীরা উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট স্থায়ী আয়ের উৎস থাকে। সেই সকল উৎস থেকেই, সংগৃহীত অর্থ গম্ভীরা গান ও গম্ভীরা উৎসবে ব্যয় করা হয়। ব্যতিক্রম হিসাবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

আলকাপের পালা, কাপ, ছড়া যেমন রচনা করেন গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত লোকশিল্পীরা তেমনি গম্ভীরার সালতামামী, চারইয়ারী, পালাগানও তারাই

রচনা করে থাকেন। গম্ভীরা গানে যেমন দোহাবকীর ভূমিকা আছে তেমনি আলকাপেও দোহারকীর ভূমিকা উল্লেখনীয়। তারা মূল গায়কের ধুয়াটুকু গেয়ে মূল্যায়ককে তাৎক্ষণিকভাবে পরবর্তী রচনার সুযোগ দিয়ে থাকেন এবং উচ্চস্বরে গেয়ে সকল শ্রোতার শ্রুতিগোচর করেন। গম্ভীরা গানের চার ইয়ারী অংশের সঙ্গে আলকাপ গানের কাপের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আলকাপ গানে বৈঠকি অংশে যেমন নানাধরনের গানের উপস্থাপনা করা হয় তেমনি গম্ভীরা গানের টপ্পা-ঠুংরী অংশে অনুরূপ গান গাওয়া হয়। গম্ভীরায় যেমন নানাবিধ সমস্যার কথা, অভিযোগের কথা শিবকে উপলক্ষ্য করে গানের সুরে বা সংলাপের মাধ্যমে বলা হয় তেমনি আলকাপ গানে গম্ভীরার শিবের ভূমিকা পালন করে থাকেন মোড়ল। সাধারণত দলের খলিফাই অনুরূপ ভূমিকায় আসরে অবতীর্ণ হন। আলকাপ ও গম্ভীরা উভয় ক্ষেত্রেই নারী চরিত্রের ভূমিকায় পুরুষ ছোকরা বা নাচিয়েরা অংশ নিয়ে থাকে। তবে ইদানীংকালে যাত্রার প্রভাবে সামাজিক অবস্থাব বিবর্তনে, নারী স্বাধীনতার ক্রম অগ্রমুখীনতায় মহিলারা আলকাপ গানে অংশ নিচ্ছেন। কিন্তু গম্ভীরায তা এখনও পবিলক্ষিত হয় না। গম্ভীরা গানে এখনও দূর-দূরান্তের কোন শিল্পীকে দেখা যায় না। কিন্তু আলকাপ গান পঞ্চরস অপেরায পরিণত হয়ে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করায় বহুদূর দূরান্তের শিল্পী পেশাদারী ভূমিকা নিয়ে আলকাপ দলে অংশ নিচ্ছেন। প্রসঙ্গত মহাতাব মণ্টু, দানেস, ফুলচাঁদ প্রভৃতি খলিফাদের দলের বহু শিল্পীই ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, হুগলি থেকে আসছেন।

আলকাপ ও গম্ভীরা একই ধরনের চর্তুর্দিকে দর্শক বেষ্টিত আসরে অভিনীত হয়। উভয় লোকনাট্যেই কখনও কখনও অভিনেতারা দর্শকের মধ্যখানে গিয়ে দর্শকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দর্শককেও অভিনয়ের সাথে যুক্ত করে নেন। বিযয়বস্তুর দিক দিয়েও আলকাপ ও গম্ভীরার মধ্যে কিছু কিছু অমিল খুঁজে পাওয়া যায়। গম্ভীরা গানে রাজনৈতিক বক্তব্য বহুক্ষেত্রে সরাসরি উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু আলকাপ গান ততটা অগ্রসর হতে পারেনি। তবে ছড়া বা কাপের মাধ্যমে বর্তমানে কিছু কিছু রাজনৈতিক

সমস্যার কথা গুরুত্ব পাচ্ছে। গম্ভীরা ও আলকাপ উভয় লোকনাট্যেই কৃষক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কখনও সোজাসুজি আবার কখনও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে উভয় লোকনাট্যই সমধর্মী। পূর্বে উভয় ক্ষেত্রেই পোশাক পরিচ্ছদ বা মেকআপের ব্যাপারে বাহুল্য ছিল না। কিন্তু গম্ভীরা গানে পালার সংযোজন এবং আলকাপে যাত্রাকে অনুকরণের মাধ্যমে সাজ-পোশাকের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আলকাপ যদিও বয়সে অনুজ কিন্তু আলকাপের সুরের কাছে একসময়ে গম্ভীরা ছিল ঋণী। ৬০/৭০ বছর আগে আলকাপের পালাগানকে সুফী মাস্টার যেমন গম্ভীরার অন্তর্ভুক্ত করলেন তেমনি অমৃতির লোহারাম খলিফা আলকাপের উপভোগ্য সুরগুলি গম্ভীরায় আনলেন। পরবর্তীকালে গম্ভীরার খ্যাতনামা শিল্পী অমরনাথ মণ্ডল ৪০/৫০ বছর আগে গম্ভীরাকে বিলম্বিত লয়ে গেয়ে আলকাপ থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেন।[৭]

আলকাপ ও খন

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি, তপন, বংশীহারী, গঙ্গারামপুর, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ প্রভৃতি থানায়, মালদহ জেলার চাঁচল, বামনগোলা, গাজোল থানায়, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সীমান্ত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে এবং বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার কোথাও কোথাও খন লোকনাট্য প্রচলিত। 'খন' অধ্যুষিত এলাকায় জনসাধারণ 'খ্যানের গান' বলে অভিহিত করে থাকেন খন গানকে। কারো মতে 'খন' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'স্কন' শব্দ থেকে।[৮] যার অর্থ হল মুহূর্ত। এই লোকনাট্য তাৎক্ষণিক রচিত হয় বলে এরূপ নামকরণ। মতান্তরে 'খন' শব্দটি 'খণ্ড' শব্দের বিবর্তিত রূপ।[৯] জীবনের একটি খণ্ড চিত্র এখানে ধরা পড়ে।

খন লোকনাট্য এলাকাব দেশী পলি রাজবংশী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের দ্বারা রচিত উপস্থাপিত হয়। তবে বাংলাদেশে খন লোকনাট্যে মুসলিম শিল্পীরাও অংশ গ্রহণ করে থাকেন। জবেদা মাডার লতিফ জৈগুন খন দুটি মুসলমান

সমাজের জীবন কাহিনী নিয়েই তৈরি। কিন্তু ওপার বাংলায় এখনও খনের প্রচলন দেশী পলিরাজবংশীদেব মধ্যে সমধিক। লোকনাট্য আলকাপ কিন্তু হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিল্পীদের দ্বারাই সৃষ্ট এবং উভয় সম্প্রদায় কর্তৃকই তা আসরস্থ হয়। কিন্তু উভয় বর্ণের মধ্যে অর্থনৈতিক সামাজিক দিক দিয়ে নিম্নশ্রেণীর বা পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষই অংশগ্রহণ করে থাকেন। তবে ইদানিংকালে যারা দল গঠন করেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ উক্ত শ্রেণী বহির্ভূত। তাবা নিছক পেশা বা ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়েই আলকাপ দলে অংশগ্রহণ করেন।

আলকাপের মতই খনের পালাগুলি গ্রামাঞ্চলের বা পল্লী বাংলার সাময়িক ঘটনা নিয়ে রচিত। তবে আলকাপ-এ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়কে অবলম্বন করেও পালাগান রচনা করা হয় কিন্তু খন লোকনাট্যে তা দেখতে পাওয়া যায় না। উভয় শ্রেণীর লোকনাট্যে সামাজিক বিষয়কে অবলম্বন করে কোথাও কোথাও রাজনৈতিক বক্তব্য শ্রেণী সংঘাতের চেতনা সঞ্জাত হয়ে শিল্পীরা উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে আলকাপের মোড়ল উচ্ছেদের কাপ, ডোমনির কাপ এবং খনে 'বিহই বিহাইল পালা' প্রভৃতি।

উভয় লোকনাট্যের গানের প্রাধান্য থাকে, তবে ইদানিংকালে আলকাপের মধ্যে কলকাতার চিৎপুরী যাত্রার বেনোজল প্রবেশের ফলে গানের প্রাধান্য জঙ্গীপুরের দলগুলিতে কম দেখা যাচ্ছে। খন লোকনাট্যে কিন্তু এখনও গানের প্রাধান্য বর্তমান।

আলকাপ ও খন উভয় লোকনাট্যেই যেমন একদিকে গীতি সংলাপ দেখতে পাওয়া যায় তেমনি গদ্য সংলাপেরও ব্যবহার হয়।

খন লোকনাট্যে নায়ক নায়িকার নামকরণের বঙ্গুঙ্গে বহুক্ষেত্রে ব্যবহৃত সরঞ্জমের নাম ব্যবহার করা হয়। যেমন নায়িকার নাম চাকা ইসরী, পাম্পীন সরী, হ্যাচাকসরী, সাইকেলসরী। 'সরী' শব্দের অর্থ মহিলা বা কন্যা বা নারী। নায়কের নাম হ্যান্ডেল বাউদিয়া, ইঞ্জিন বাউদিয়া প্রভৃতি। আলকাপে কিন্তু এ ধরনের নামকরণ লক্ষ্য করা যায় না।

আলকাপের পালাগুলিতে যেমন লিখিতরূপ নেই তেমনি খন লোকনাট্য-এর পালাগুলিও অলিখিত, বড়জোর পালায় ব্যবহৃত গানগুলি খাতায় লেখা থাকে। দলের খলিফা বা ওস্তাদ বা মাস্টার শিল্পীদের সামনে পালার কাহিনী ও ঘটনাগুলি বলে দেন। শিল্পীরা আসরে তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করে ঘটনা। চরিত্রানুযায়ী সংলাপ প্রয়োগ করে থাকেন। বহুশিল্পী আবার তাৎক্ষণিকভাবে গানও তৈরি করে আসরস্থ করেন। এটা লোকনাট্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খন ও আলকাপ উভয় লোকনাট্যই দর্শক বেষ্টিত চারদিক খোলা আসরে অভিনীত হয়। আসরের অভিনয়ের জায়গাটুকু মাটি ফেলে সামান্য উঁচু করে দেওয়া হয়, উপরে বড়জোর চাঁদুয়া বা খড়পাতা দিয়ে তৈরি সামান্য আস্তরণ। আলকাপ দলে যেখানে দুই দলের প্রতিযোগিতামূলক গান হয় সেখানে দুই দল মুখোমুখি বসে, খন লোকনাট্যে তা হয় না। আলকাপ ও খন লোকনাট্যে সাজঘর থেকে আসরে আসার জন্য দর্শকদের মধ্য দিয়ে একটা সরু পথ থাকে।

আলকাপ লোকনাট্যে যন্ত্রশিল্পীরা বা বাজনদাররা আসরের দুই দিকে মুখোমুখি ভাবে বসেন কিন্তু খন লোকনাট্যে যন্ত্রশিল্পীরা বসেন বৃত্তাকার আসরের কেন্দ্রস্থলে।

আলকাপ ও খন উভয়প্রকার লোকনাট্যেই অভিনয়ে দোহারকী ও যন্ত্রশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। দোহারকীরা উভয় প্রকার লোক নাট্যেই মূল নায়কের ধুয়াটুকু উচ্চস্বরে গেয়ে থাকে।

উভয় লোকনাট্যেই পূর্বে মহিলার ভূমিকায় পুরুষরা নামত, খন লোকনাট্যে রাজবংশী দেশী পলি সমাজে দৃষ্টিভঙ্গির উদারতার জন্যে আজকাল অনেক মেয়েকে স্ত্রী ভূমিকায় নামতে দেখা যায়।[১১] কোনো কোনো আলকাপ দলেও বর্তমান মহিলাদের চরিত্রে মহিলারাই অংশ গ্রহণ করেন। মহাতাব পঞ্চরস অপেরায় সমস্ত নাবী চরিত্রে নারীরাই রূপদান করেন, আবার বাবুল পঞ্চরস অপেরা, জয়রানী অপেরা প্রভৃতি দলে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই নারী ভূমিকায় নামে। আলকাপ গান এখন লোকালয়ে

অভিনীত হয়, দ্বিতীয়তঃ জুয়ার আসরের পরিবর্তে টিকিট কেটে, চাঁদা তুলে আলকাপ গান বহু জায়গায় হওয়াতে নারীদের নিরাপত্তার বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা কম থাকে। সর্বোপরি আলকাপ দলে নারীদের অংশগ্রহণে সামাজিক বাধা বিপত্তি নারী সম্পর্কে নব মূল্যায়নে অনেকটা অপসারিত।

ধামগান ও আলকাপ

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী সম্প্রদায় কর্তৃক লোকনাট্য ধামগান অনুষ্ঠিত হয়। ধামগান শব্দটি দুভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে, 'ধাম' অর্থে যদি পবিত্রস্থান ধরি, তাহলে সেই ধামে যে গান হয় তাই 'ধাম গান'। আর গান যেখানে হয়, সেই গানের জন্য যে স্থান অর্থাৎ ধাম তাই ধামগান।[১১]

ধাম লোকনাট্যের বিষয়বস্তু সামাজিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আলকাপ লোকনাট্যের বিষয়বস্তু সামাজিক পৌরাণিক ঐতিহাসিক রূপকথা বিষয়ক কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়। ইদানিংকালে কিছু কিছু পালা বা কাপে রাজনৈতিক বক্তব্য আশ্রয় পাচ্ছে। উভয় লোকনাট্যেই শুভশক্তির জয় ও অশুভশক্তির পরাজয়ের মাধ্যমে পালার সমাপ্তি ঘটে। ধাম লোকনাট্যের কনসার্টের পর দুই সমীর নাচের মধ্য দিয়ে আসরের প্রযোজনার সূচনা হয় কিন্তু আলকাপের কনসার্টের পর হয় আসর বন্দনা।

উভয় লোকনাট্যেরই আসর হয় দর্শকবেষ্টিত, উপরে থাকে সামান্য আস্তরণ। বাজনদার দোহারকিরা আসরের দুই দিকে বসেন মুখোমুখিভাবে। আসরের সঙ্গে সাজঘরের যোগাযোগ রাখা হয় দর্শকের মধ্যখান দিয়ে সরুপথের মাধ্যমে।

আলকাপের আঙ্গিক পাঁচটি — যেমন আসর বন্দনা, বৈঠকি, ছড়া, কাপ ও পালা। তাই আলকাপের অপর নাম পঞ্চরস। কিন্তু ধামগানের পুরুষরাই স্ত্রী-ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন। উভয় লোকনাট্যেই শিল্পীরা স্বপ্ন-

আলোকে মুখকে উজ্জ্বল করার জন্য চুমকি ব্যবহার করেন।

ধামগানের পালাগুলির একটা সাধারণ প্যাটার্ন আছে। সব পালাতেই দেউলিয়া বা গিরির সাগরেদ বা মোড়ল বা কমেডিয়ান থাকে যে প্রথম দিকে দেউলিয়া বা জমিদারেব স্বার্থ দেখলেও শেষের দিকে দেউলিয়ার বিরুদ্ধে বর্গাদার বা শোষিত ঘাতকের পক্ষে চলে আসে।[১৬] আলকাপ লোকনাট্যের কাপে বা পালায় এ ধরনের কোন নির্দিষ্ট প্যাটার্ন নেই। উভয় লোকনাট্যেরই উপস্থাপন করার ব্যাপারে মাস বা ঋতুর কোন বাধ্যবাধকতা লক্ষ্য করা যায় না।

আলকাপ ও কুশান

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় কুশান নামে এক লোকনাট্য প্রচলিত আছে। নাটকাকারে প্রযোজিত কুশান পালা কুশান যাত্রা নামে অভিহিত হয়। কুপা বাঁশি ছাড়া যেমন বিষহরার গান গীত হয় না তেমনি বেনা নামক একপ্রকার তারযন্ত্র ছাড়া কুশান গান হয় না।[১৭] সেজন্য এই অনুষ্ঠানকে অনেক সময় 'বেনা কুশানে' বলে। আলকাপের ক্ষেত্রে এ ধরনের নিদিষ্ট কোন বাদ্যযন্ত্রের বাধ্যবাধকতা নেই।

কুশান পালার কাহিনী রামায়ণ ভিত্তিক। কিন্তু আলকাপের পালার কাহিনীগুলি সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত, আলকাপের কাপ অংশটুকু কেবল সামাজিক বিষয় অবলম্বনে রচিত হয়। ইদানিংকালে কাপে কিছু কিছু রাজনৈতিক বক্তব্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিষয়বস্তু রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও কৃপণের ছড়া ও গানের ভাষা আঞ্চলিকতা এবং তা পূর্ণরূপ পল্লী সুবে পরিবেশিত হয়। আলকাপের সংলাপ একসময় পূর্ণরূপেই আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত ছিল। কিন্তু আলকাপের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে কলকাতার যাত্রাকে অনুকরণের মাধ্যমে। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পীরা একই দলে থাকায় সংলাপের ভাষা হিসাবে কেন্দ্রীয় বাংলা ভাষাই প্রাধান্য পাচ্ছে। তবে কাপ অংশে সঙান বা কাপে কিছু কিছু আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ প্রয়োগ করে হাস্যরসের সৃষ্টি করে থাকেন। সুরের ক্ষেত্রে ও আলকাপে হিন্দী বাংলা ছায়াছবিব অনুকবণে দেখা যাচ্ছে।

কুশান লোকনাট্যে খোল করতাল হারমোনিয়াম ও বেনা যন্ত্রের সাহায্যে গুরু বাইজ বা ঐকতানের পর বন্দনা গীতের এবং তারপরে মূল পালা আরম্ভ হয়। অর্থাৎ ঐকতান ছাড়া কুশানেব আঙ্গিক দুটি। কিন্তু আলকাপের আঙ্গিক ঐকতান ছাড়া পাঁচটি। যে তিনটি বেশি তা হল বৈঠকি বা খেমটা ছড়া বা আলকাপের প্রাণকাপ। আলকাপের মতই কুশান যাত্রা দীর্ঘক্ষণ ধরে অভিনীত হয়। যতক্ষণ অনুষ্ঠান চলে কুশান লোকনাট্যে মূল গায়েন বেনা যন্ত্রটি বাজিয়ে যান এবং প্রয়োজন বোধে যন্ত্রটি নামিয়ে মধ্যে মধ্যে একটি চরিত্ররূপে অভিনয় করেন। আলকাপের ক্ষেত্রে বাদ্যকার বা দোহারদেরও এই ভূমিকা অবলম্বন করতে হয়। কুশান লোকনাট্যে সঙ্গীতের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনার পটভূমিকায় ভাব পাঁচটি, অল্প বয়স্ক বালিকার নৃত্য অবিরাম চলতে থাকে। কিন্তু এ ধরনের কোন দৃশ্য আলকাপ-এ দেখা যায় না।

আলকাপ লোকনাট্যে সাজঘর থেকে আসরে আসার জন্য দর্শকদেব মধ্য দিয়ে একটা রাস্তা থাকে কিন্তু কুশান লোকনাট্যে সমস্ত অভিনেতা ও বাদ্যকরই আসরে বসে থাকেন যার যখন প্রয়োজন তখন উঠে এসে অংশ গ্রহণ করেন।

আলকাপ ও পালাটিয়া

উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার আরেকটি বহুল প্রচারিত লোকনাট্য হল পালাটিয়। পালাটিয়ায় তিনটি রূপ বর্তমান। যেমন — মান পাঁচালী, রঙ পাঁচালী, খাস পাঁচালী। মান পাঁচালী, রঙ পাঁচালী ও খাস পাঁচালীর বিষয়বস্তু যথাক্রমে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বা ধর্মীয় কাহিনী ভিত্তিক, স্থানীয় ঘটনা বা কাল্পনিক বিষয়ভিত্তিক এবং সত্যমূলক ঘটনাকেন্দ্রিক।[১৮] আলকাপে সমস্ত বিষয়গুলি নিয়েই পালা রচিত হয়। তবে কাপ অংশে আলকাপে কেবল সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ই প্রাধান্য পায়। আলকাপের পালা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত হলেও পালাটিয়ার মত বিভিন্ন উপশাখা নামে বিভক্ত হয় না। অবশ্য গৌরিশংকর ভট্টাচার্যের মতে পালাটিয়ার নীতিমূলক কাহিনী অবলম্বিত হলে

তাকে মান পালাটিয়া এবং প্রেমমূলক কাহিনী অবলম্বিত হলে তাকে ঘাস পালাটিয়া বলে।[১৬] পালাটিয়ার আসর বা মঞ্চঘনের মতই মঞ্চের মধ্যবর্তী স্থানে থাকেন বাজনদারেরা এবং তিন-চার হাত ব্যাসকেন্দ্রিক স্থানে অভিনেতারা গান বা অভিনয় ঘুরে ঘুরে করেন। আলকাপের মঞ্চ কিন্তু বর্গায়িত, মঞ্চের একদিকে বা দুই দিকে মুখোমুখিভাবে বসেন আলকাপের বাজনদার বা যন্ত্রশিল্পীরা। আসরের চারিদিক থাকে দর্শকবেষ্টিত। মধ্যবর্তী বর্গায়িত জায়গায় কুশীলবেরা নিজস্ব বা যুথবদ্ধ কলাকৌশল প্রদর্শন করেন। আলকাপের বন্দনা অংশে বিভিন্ন দেব-দেবীর মাহাত্ম্যের বিবরণ বা দেবীর কাছে অনুনয় বিনয় প্রকাশ পায় কিন্তু পালাটিয়ার 'বন্ধানা' বা বন্দনা অংশে স্থানীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করে দেবীর কাছে অভিযোগ জানানো হয়। প্রসঙ্গত চিন্তাসরী ঘাস পাঁচালী পালাটিয়ার 'বন্ধানা' অংশটির উল্লেখ করা যায়।[১৭] বন্ধানা অংশটিতে জলপাইগুড়ি জেলার বন্যা পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আলকাপে কিন্তু এ ধরনের বিষয় ছড়াগান অংশে প্রাধান্য পায়। এ ধরনের খরা, বন্যা, মহামারী প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে ছড়াগানের নিদর্শন সংকলন অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। পালাটিয়ায় যেমন মহান বা মন্ত্রতন্ত্র জানা সাধু বা ফকির জাতীয় চরিত্র থাকে[১৮] তেমনি আলকাপেও থাকে। এ ধরনের চরিত্র বিবেকের ভূমিকাও পালন করে থাকে, ভবিষ্যতে কি ঘটবে বা অন্যায়কারী চরিত্রকে সাবধান এবং সত্যের পথে বিচরণকারী চরিত্রের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গানের মাধ্যমে উপদেশ নির্দেশ দিয়ে থাকে।

আলকাপ

বিষহরা। বিষহরি। পাঁচালি। মনসার গান। কানী বিষহরি।

বাংলাদেশ সর্পসংকুল। সর্পদংশনে গ্রামাঞ্চলে এখনও বহু লোক মারা যান। তাই লৌকিক জীবনে সাপভীতি ও উৎকণ্ঠার বিষয়। সাপের দেবী মনসা। সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেমন দক্ষিণরায় বা বনবিবির পূজা অর্চনা করা হয় তেমনি সাপের কামড় থেকে

অব্যাহতি পাবার জন্য গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র মনসা পূজা প্রচলিত। আবার মনসা পূজার সময় বা অন্য সময়ে মনসামঙ্গলের কাহিনীটিকে অবলম্বন করে যে লোকনাট্য বাংলা জুড়ে সর্বত্র আসরস্থ হয় তা কোথাও বিষহরা বা বিষহরি আবার কোথাও মনসার গান বা পাঁচালি নামে পরিচিত। ভিন্ন নামে খ্যাত হলেও উপস্থাপনের দিক দিয়ে কিন্তু বিশেষ কিছু ভিন্নতা দেখা যায় না। বিষহরা গান কোথাও সাতদিন বা এগারো দিন ধরে চলে আবার কোথাও কোথাও একমাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা হয়।[১৯] আলকাপ কোন ব্রত বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক নয়, কিন্তু বিষহরা গান মনসা দেবীর মাহাত্ম্যমূলক। অন্য কোন বিষয় মনসা গানে দুর্লক্ষ্য। মনসা গানে একজন মূল গায়েন চামর হাতে দাঁড়িয়ে কখনও গান, কখনও সংলাপ আবার মধ্যে মধ্যে কখনও বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়ের মাধ্যমে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। মনসাগানে আলকাপের মত নাটকের উপাদান না থাকলেও মধ্যে মধ্যে মূল গায়েন, দোহার বাজনদারদের দ্বারা মনসামঙ্গল আখ্যানের বিভিন্ন অংশ অভিনীত হয়। এই অংশে কখনও কখনও কোন চরিত্র সঙালের ভূমিকা পালন করে হাস্যরসের সৃষ্টি করে দর্শক সমাজকে ভাববিভোর অবস্থা থেকে সাময়িকভাবে মুক্ত করে ড্রামাটিক রিলিফ প্রদান করেন। মূল গায়েন কখনও দর্শকের মধ্য দিয়ে গান করে প্যালা বা ভেট সংগ্রহ করেন। এই ধরনের দৃশ্য আলকাপেও দেখা যায়। এই উপকরণের দ্বারা ও বিষয়বস্তুর দ্বারা দর্শক ও শিল্পীর মধ্যে একটা জনসংযোগ ও আত্মিক যোগাযোগ সংঘটিত হয়। প্রসেনিয়ামকে ভেঙে দর্শকদের মধ্য পর্যন্ত গানের আসরকে টেনে নিয়ে যাওয়া লোকনাট্যের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কখনও মূল গায়েন উপহারদানকারীর নামে তাৎক্ষণিকভাবে গানও রচনা করে ফেলেন।[২০]

মনসা গান হবার সময় কোথাও কোথাও আসরের একদিকে ২/৩ হাত লম্বা একদেড় হাত চওড়া চৌবাচ্চা খোঁড়া হয় এবং পান দিয়ে সাতটি ঘাট চিহ্নিত করা হয়। তারপর সেই চৌবাচ্চায় সোলার নির্মিত নৌকায় একটি শায়িত (লখিন্দর) ও একটি বসে থাকা (বেহুলা) পুতুল রাখা হয়।

তারা জলে জলে ভেসে চলে। এ ধরনের দৃশ্য মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরপুর থানার বিভিন্ন জায়গায় বিষহরির গানে দেখেছি। আলকাপের মধ্যে কিন্তু এ ধরনের কোন দৃশ্য দেখা যায় না।

আলকাপ ও বোলবাহি

মালদা জেলার আর একটি লোকনাট্য হল বোলবাহি বা বোলাহি। বোলাহিতে মূলতঃ আলকাপের মত দ্বৈত (ডুয়েট) সঙ্গীতই থাকে। প্রাচীন আলকাপও নাকি তাই ছিল বলে আবুল কাশেম (ব্রাহ্মণ গ্রাম, সুজাপুর, মালদহ), দেবেন্দ্রনাথ বসাক (পঞ্চনন্দপুর, মালদহ) প্রভৃতি শিল্পী মনে করেন। তাদের মতে এই বোলবাহিই পরবর্তীকালে আলকাপে পরিণত হয়। কিন্তু আলকাপের প্রাণরস হল কাপ। তা কিন্তু বোলবাহিতে কোনদিনই ছিল না। তাই আলকাপের আর কোন শিল্পী এই অভিমতকে সমর্থন করেননি। আলকাপের পাঞ্চ-আঙ্গিকের মধ্যে দ্বৈত সঙ্গীত একটি আঙ্গিক মাত্র, কিন্তু বোলবাহিতে আলকাপের মত দ্বৈত সঙ্গীতই একমাত্র আঙ্গিক। বর্তমানে মালদহে বোলবাহির কোন দল বা সংগঠনের খোঁজ পাওয়া যায় না।

আলকাপ ও নটুয়া

উত্তরবঙ্গে নটুয়া নামে একধরনের লোকনাট্য-এর নির্দেশ পাওয়া যায়। নাটক থেকেই নটুয়া শব্দের উৎপত্তি বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। নটুয়া লোকনাট্যের বিষয়বস্তু কিন্তু কেবল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করেই গৃহীত হয়, এটা অনেকটা মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, নদিয়া, বীরভূম জেলার বোলান গানের মত। আলকাপের কাপের বিষয়বস্তু সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকলেও পালার বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত। আরেকদিকের পার্থক্য হল নটুয়া আনুষ্ঠানিক বা পূজা আচার কেন্দ্রিক, কিন্তু আলকাপ পূজা-আচার নিরপেক্ষ। বছরের যে কোন সময় যে কোন জায়গায় আসরস্থ হতে পারে।

আলকাপ ও ব-খেলা

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার খন লোকনাট্যের পাশাপাশি 'ব-খেলা' নামে একধরনের লোকনাট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।[২১] আলকাপের মতই ব-খেলা লোকনাট্য ধর্ম-আচার নিরপেক্ষ। আলকাপের বন্দনা গানে যেমন হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে মুসলিম পীর সাহেবদের বন্দনা গান গাওয়া হয় তেমনি ব-মেলাতেও অনুরূপ নিদর্শন খেলে। যদিও পীর, ফকির, সুফি, দরবেশ এঁরা ধর্মসমন্বয়ের প্রতীক। 'ব-খেলার একটি আসর বন্দনা' ঃ

শ্যামা মায়ের নামটি তোমার
মা বলিয়া ডাকরে ডাক
পূর্বে বন্দনা কবি — বর্ম নিরঞ্জন
তাঁহারও চরণ বন্দি মস্তকের উপর
উত্তরে বন্দনা করি কালীমায়ের চরণবন্দি
তাঁহারও চরণে হামরা প্রণাম করি।
পশ্চিমে বন্দনা করি পীরসাহেবের চরণবন্দি
তাঁহার ঐ চরণে হামরা সেলামও করি।[২২]

উভয় লোকনাট্যেরই মধ্যে গানে গানে উক্তি-প্রত্যুক্তি চলে। আলকাপ লোকনাট্যে যেমন সংলাপ স্থানীয় কথ্যভাষা প্রাধান্য পায়, তেমনি ব-খেলাতেও কথ্যভাষা সংলাপ রচিত হয়। ব-খেলায় স্থানীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে পালা রচিত হয়। আলকাপে অনুরূপ বিষয়বস্তু ছাড়াও সামাজিক, পারিবারিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বিষয় নিয়ে পালা বাধা হয়। আলকাপের মতই ব-খেলা আচার-অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ। যে কোন সময়ে যে কোন পরিবেশে আসরস্থ হয়। আলকাপ লোকনাট্যে আসর বন্দনার পর বৈঠকি, ছড়া, কাপ তারপর শেষে পালা শুরু হয় কিন্তু ব-খেলা আসর বন্দনার পরেই পালাভিনয় শুরু হয়। আলকাপ পরবর্তীকালে ব্যবসায়িক সাফল্য

লাভ করায় এলাকা বিস্তৃত হয়েছে এবং কথ্য ভাষার স্থলে কেন্দ্রিয় বাংলা উপভাষার মাধ্যমেই সংলাপ রচিত হচ্ছে। কিন্তু ব-খেলা এখনও পেশাদারী ভূমিকা অবলম্বন না করায় তার ইতিহাসকে বিন্দুমাত্র বিসর্জন দেয়নি। তবে কিছু কিছু ব-খেলার শিল্পীরাও পেশাদারী ভূমিকা নিয়ে আলকাপে আসছে। যেমন মালদহের কালিয়াচক থানার বাখরাপুরের ইলিয়াস খলিফার দলের বিজয় স্বর্ণকার, ইলা তালুকদার, লক্ষ্মী মহন্ত, প্রতিমা বর্মন প্রভৃতি পশ্চিম দিনাজপুরেব শিল্পীরা ব-খেলা, খনের শিল্পী। উভয় লোকনাট্যেই একসময় পুরুষরাই নারী চরিত্র অভিনয় করত। এখনও পুরুষদের পাশাপাশি কিছু কিছু মহিলারাও নারী চরিত্রে রূপদান করছেন। সাধারণ লোকনাট্যের মত উভয় লোকনাট্যেই ধর্মের জয় ও অধর্মের ক্ষয় দেখানো হয়। তবে ধর্ম বলতে মানবিক ধর্মই প্রাধান্য পায়।

আলকাপ ও ডোমনি

মালদহ জেলার অন্যতম লোকনাট্য হল ডোমনি। এটাকে আবার নাউয়্যা-নাউয়্যানী বা বাউদ্যা-বাউদানী বলা হয়।[২৩] ডোমনি গান যদিও গম্ভীরার মত অতটা জনপ্রিয় নয় তথাপি এলাকার জনজীবনের সাথে ডোমনি গানের গভীর জনসংযোগ বর্তমান। জনৈক শিল্পীর মতে আগে ডোম-ডোমিনি বিবাদ বা ডোম-পরিবারের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে এই গান তৈরি হত বলে ডোমিনি নামকরণ।[২৪] কিন্তু বর্তমান ডোমনি লোকনাট্যে অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের সামাজিক পারিবারিক সমস্যা নিয়েও পালাগান আসরস্থ হচ্ছে।

আলকাপ গানের মত নারীমুক্তি, পণপ্রথা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যা নিয়েও শিল্পীরা পালাগান তৈরি করছেন। ডোমনি গানে আলকাপের মত পালা আছে কিন্তু আলকাপের মত কোন আঙ্গিক ডোমনি গানে নেই। আলকাপের মত ডোমনি গানের শিল্পীরাও অধিকাংশই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাদপদশ্রেণীর এবং উভয়

লোকনাট্যই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ এবং বছরের যে কোন সময় অভিনীত হতে পারে।

আলকাপ ও চোরচুরনি

প্রান্ত উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে কালীপূজার সময় এক বিশেষ ধরনেব সংলাপমূলক গানের অনুষ্ঠান কবে যাকে বলা হয় চোর-চুরনির গান।

বিশেষজ্ঞের মতে চোরদের বিশ্বাস-এ যারা বিশ্বাসী বা মহালয়ার দিনকে যারা বছরের শেষ শুরুর দিন বলে বিশ্বাস করে এমন এক সংহত লোকগোষ্ঠীর মধ্যে চোর ও চোরনীর জীবন অবলম্বনে এই অসম্পূর্ণ লোকনাট্যের সূচনা হয়ে ক্রমে তা বিস্তৃত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের পিছনে চোরদের যে বিশ্বাস নিহিত ছিল তা হল — মহালয়ার দিনে কোন চোর যদি কোনো গৃহস্থের বাড়ি থেকে কিছু চুরি করে এনে পরের অমাবস্যায় অর্থাৎ কালীপূজাব দিন তা নির্বিঘ্নে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারে তাহলে সেই চোর সেই বছর নির্বিঘ্নে ও সাফল্যের সঙ্গে চুরি করতে পারবে।[২৫] চোর-চুরনি লোকনাট্যে চোর-চুরনির উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে দিয়ে দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য অভাব অনটনের পাশাপাশি গত এক বছরের সামাজিক, নৈসর্গিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যে সব দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তারই বার্ষিক বিবরণ থাকে। এটা অনেকটা আলকাপের ছড়াগান এবং গম্ভীরার সালতামামীর অনুরূপ। তাই এটা এক ধরনের ফোক জার্নালিজম বা লোক সাংবাদিকতা।[২৬]

আলকাপসহ প্রায় সকল লোকনাট্যের মতই চোর-চুরনি গানে পুরুষরাই নাবী সেজে অভিনয় করেন। আলকাপ গান অনুষ্ঠিত হয় একটা নির্দিষ্ট আসরে, কিন্তু চোর-চুরনি গান বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে গাওয়া হয়, অর্থাৎ এখানে পথ বা বাডির উঠানই আসর। আলকাপের মধ্যে পালা বা কাপে যেমন একটি আখ্যানের শুরু হয়ে ক্রমপরিণতির মধ্যে দিয়ে সমাপ্তি ঘটে, তা কিন্তু চোর-চুরনিতে হয় না, এ ধরনের উপকরণ বা আঙ্গিক চোর-চুরনিতে অনুপস্থিত। চোর-চুরনির গানে গানে উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে

কনফ্লিক্ট বা সংঘাত বা ছন্দের সৃষ্টি হয় ঠিকই কিন্তু নাটকের প্লট, নাট্যোৎকণ্ঠা প্রভৃতি দেখা যায় না, যা কিন্তু আলকাপে দেখা যায়। সর্বোপরি চোর-চুরনি আচার অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক এবং বছরের নির্দিষ্ট সময়েই বা দিনেই তা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আলকাপ আচার-অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ এবং বছরের যে কোন সময়ে অভিনীত হতে পারে।

আলকাপ ও লেটো

লেটো লোকনাট্যের প্রচলন সাধারণত বীরভূম, বর্ধমান ও হাওড়া জেলায় দেখা যায়। তবে বীরভূম জেলাতেই লেটোর প্রচলন সর্বাধিক। লাট থেকেই লেটো শব্দের উৎপত্তি। নাট > নেটো > লেটো। বীরভূম, বর্ধমান জেলায় বহু শব্দের অন্তর্গত 'ন' 'ল' হিসাবে উচ্চারিত হয়। বহু নিরক্ষর মানুষ 'নাক' শব্দকে 'লাক' উচ্চারণ করেন। সমালোচকের মতে লেটো নামটিব মধ্যে নাটক কথাটি খুঁজে পাওয়া যায়।[২৭] আলকাপের মত লেটো লোকনাট্যেও নৃত্য, গীত ও হাস্যরসের প্রাধান্য থাকে। আলকাপের কাপের মতই লেটো লোকনাট্যে পল্লীজীবনের সামাজিক পারিবারিক বিষয়কে নিয়ে পালা তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞের মতে গ্রামের অশিক্ষিত নিম্নসম্প্রদায়ের মধ্যে লেটো প্রচলিত বলিয়া দর্শক রুচি অনুযায়ী ইহার নৃত্যগীতে যথেষ্ট অশ্লীলতা থাকে।[২৮] আলকাপ লোকনাট্য সহ বহু লোকনাট্যে এই নিদর্শন মেলে, তবে এই অশ্লীলতা গ্রাম্য মানুষের সরলতা কৃত্রিমতার পরিচয়। এটা কোন নিন্দনীয় ব্যাপার নয়। বহু শিল্পী আলকাপ ও লেটো উভয় লোকনাট্যেই কাজ করেন। যেমন বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার হারেজ শেখ খলিফা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুরম থানার সুকুমার দাসের মত বেশ কিছু শিল্পী উভয় লোকনাট্যেই দেখা যায়। আসর বন্দনার ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আলকাপ সহ অন্যান্য লোকনাট্যের মতই লেটো লোকনাট্যের গান পূর্ব রচিত থাকলেও পালার সংলাপ লিখিত থাকে না, শিল্পীরা আসরে তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করে সংলাপ প্রয়োগ করেন। উভয় লোকনাট্যই অনানুষ্ঠানিক বা আচার নিরপেক্ষ বছরের যে কোন সময়ে আসবস্থ হতে পারে।

আলকাপ ও মাছানি

ছো-এর মত মাছানি লোকনাট্য পুরুলিয়া জেলার অন্যতম সাংস্কৃতিক সম্পদ। বিশেষজ্ঞের মতে গাজন উৎসবের সঙ্গে অঙ্গীভূত প্রাথমিক ছো যেমন সং-এরই নামান্তব, তেমনি মাছানিও গাজন উৎসবে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ সংযাত্রা।'[১] আলকাপের কাপের মতন মাছানি লোকনাট্যে সামাজিক বা পারিবারিক কোন ঘটনাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে আসরস্থ হয়। 'বাতকানা জামাই', 'মানিক জোলার কাপ', 'বোকা তাঁতি' প্রভৃতি কাপ উভয় লোকনাট্যেই পরিবেশিত হয়। আলকাপের মত মাছানি লোকনাট্যেও পুরুষবা নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। আলোচ্য দুটি লোকনাট্যেরই সংলাপে স্থানীয় কথ্যভাষা প্রাধান্য পায়। মাছানি একসময়ে গাজন উৎসবের অঙ্গীভূত ছিল এবং নির্দিষ্ট উপলক্ষেই তা প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে মাছানি আনুষ্ঠানিক গণ্ডি অতিক্রম করে উৎসবের বাইরে যে কোন সময় অভিনীত হতে পারে। কিন্তু আলকাপ বরাবরই অনানুষ্ঠানিক আচার উৎসব নিবপেক্ষ। কারণ শিল্পীদের মতে আলকাপেব সৃষ্টিকর্তা বোকাকানা আলকাপের প্রবর্তক এবং তিনি সামাজিক পারিবারিক সমস্যা নিয়েই গানে গানে উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে আলকাপের কাপ তৈরি করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতেন এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোঁচা বা হুল দর্শক সমাজকেও বিদ্ধ করে সামাজিক দিক দিয়ে সচেতন করে তুলেছেন। মাছানি লোকনাট্যে আসর বন্দনার পরেই কাপ শুরু হয় কিন্তু বর্তমানে আলকাপে আসর বন্দনার পর বৈঠকি বা খেমটা ছড়াগান তারপর কাপ শুরু হয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বিভূতিভূষণ মারি, সাজিরুদ্দিন প্রমুখ শিল্পীদের অভিমত অনুসারে প্রাচীন আলকাপের আঙ্গিকও তাই ছিল। কালক্রমে আলকাপের আঙ্গিকের পরিধি বিস্তৃত হয়ে ছড়াগান, পালা প্রভৃতির সংযোজন ঘটে।

আলকাপ ও ছৌ

বিশেষজ্ঞের মতে বাৎসরিক সূর্যোৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা এই তিনটি পাশাপাশি রাজ্যে ছৌ নৃত্য নাট্যের অনুষ্ঠান হয়।[১০]

ছৌ এককালে গাজন উৎসবের অঙ্গীভূত ছিল ঠিকই কিন্তু মাছানির মত কালক্রমে উৎসবের গণ্ডিকে অতিক্রম করে ব্যাপ্তি ঘটেছে। ফলত মাছানি, আলকাপের মত বছরেব যে কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

কাহিনীর অবিচ্ছিন্নতা, তীব্র নাট্যবেগ ও উত্তেজনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নাট্যরস ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যম নৃত্য বটে, নাট্যরস জমিয়ে তোলাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।[৩২]

ছৌ নৃত্যনাট্যে মুখোশের ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু আলকাপ, খন, ডোমনি, পালাটিয়া পভৃতি লোকনাট্যে তা অপরিহার্য নয়, হয়ত কোন কোন পশুর চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য নাট্যিক প্রয়োজন হলেই মুখোশের ব্যবহার হযে থাকে। কোন পৌরাণিক বিষয় নিয়ে পালা আসরস্থ হলে শিল্পীরা সাধারণ পোশাকে বা জরিব কাজ করা কিছু কিছু পোশাক ব্যবহাব করে চরিত্রকে রূপদান করেন। মুখোশের কোন ব্যবহার হয় না। আলকাপের মত ছৌ নৃত্যনাট্যও মুক্তাঙ্গনে অভিনীত হয় এবং উভয় লোকনাট্যেরই আসব বর্গাকার, দর্শকাবেষ্টিত এবং সাজঘর থেকে আসরে যাবার জন্য দর্শকদের মধ্য দিয়ে সরু রাস্তা থাকে। ছৌ নৃত্য নাট্যে অনুষ্ঠানের শুরুতেই দুজন ঢোল বাদক ঢোল বাজাতে বাজাতে বিপুল উৎসাহে প্রায় বাহ্য জ্ঞানশূন্য হয়ে অনেক সময় তারা মুখে বোল উচ্চাবণ করে। তা কিন্তু আলকাপ লোকনাট্যে দেখা যায় না। ছৌ-এর আসব বন্দনায় গণেশ ছাড়া অন্য কোন দেবদেবীর বন্দনা হয় না, কিন্তু আলকাপে যে কোন দেব-দেবীর নামে আসর বন্দনা হতে পারে। ছৌ নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু বিভিন্ন পুরাণকেন্দ্রিক। কিন্তু পুরুলিয়ার বান্দোয়ান অঞ্চলে যে কোন সামাজিক পারিবারিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, কাল্পনিক রূপকথা বিষয়ক কাহিনী অবলম্বন করে পালা রচিত হতে পারে।

আলকাপ ও বনবিবি

সুন্দরবন এলাকার জনপ্রিয় লোকনাট্য হল বনবিবি। এই লোকনাট্যের

বিষয়বস্তু বনের দেবী বনবিবি মাহাত্ম্যসূচক। লোকনাট্যটির উদ্ভব বনবিবি পূজাকে অবলম্বন করেই হয়েছিল।[৩২] কেননা সুন্দরবনের জঙ্গলে প্রবেশের আগে কাঠুরে মধুসংগ্রহকারী বা জেলেরা দক্ষিণ বায়, নারায়ণী মা, কালু খাঁ, মা জঙ্গলী, গাজী সাহেব প্রভৃতির সঙ্গে বনবিবির পূজার্চনা করেন এই বিশ্বাসে যে দেবদেবী সন্তুষ্ট হয়ে বাঘের মত হিংস্র জন্তুর হাত থেকে তাদের রক্ষা করবে। গ্রীক দেবতা ডায়োনিসাসের পূজাকে অবলম্বন করেও 'গোট সং' বা ছাগ সঙ্গীত থেকে কমেডি এবং 'ফ্যাপিক সং' থেকে ট্র্যাজেডির উদ্ভব হয়েছিল।[৩৩] তাই বনবিবি বা বনদেবীর পূজার মাধ্যমেই এই লোকনাট্যের উদ্ভব মনে করা অসমীচীন নয়। আলকাপ লোকনাট্যে যেমন বিভিন্ন উৎস থেকে কাহিনী বা প্লট নির্বাচন করে কাপ পালা রচনা করা হয় তা কিন্তু বনবিবি লোকনাট্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। বনবিবি লোকনাট্যের 'ধনামনার পালা' বা মা বনবিবি দুঃখের কাহিনী অবলম্বন করেই পালাগান অভিনীত হয়। উভয় লোকনাট্যেরই মঞ্চ বর্গাকৃতি দর্শকবেষ্টিত। বনবিবি লোকনাট্যের উৎসব বনবিবির পূজা কিন্তু আলকাপ ধর্মসূত্রেই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ। তবে বর্তমানে উভয় লোকনাট্যই বছরের যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে। বনবিবি লোকনাট্যের অনুষ্ঠান কেন্দ্রিকতা থেকে অনুষ্ঠান নিরপেক্ষতার পর্যায়ে উত্তরণ ঘটেছে। সাধারণ মানুষের নাট্যরসের পিপাসা নিবারণের মাধ্যম হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। উভয় লোকনাট্যেই ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়, সবলের অন্যায় অবিচার, নিপীড়নের হাত থেকে দুর্বলের মুক্তি পাওয়ার মাধ্যমে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে এবং দুর্বলকে জয়ী করার পিছনে বাস্তব সমাজে মানুষের সকলের দ্বারা অপমানিত হবার পর যে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে তাই কাহিনীতে ব্যক্ত হয়। ফলে কাহিনীটির দুর্বলচরিত্রটির সঙ্গে সাধারণ মানুষ একাত্ম হয়ে যায় এবং যথার্থই জনসংযোগ ঘটে। অন্যান্য লোকনাট্যের মত উভয় লোকনাট্যের শিল্পীরাই হলেন সামাজিক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাদপদ, নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত।

আলকাপ ও টনসা যাত্রা

২৪ পরগনা, নদিয়া, বর্ধমান, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি প্রভৃতি জেলায় রামায়ণ, কদাচিৎ রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বন করে এক ধরনের যাত্রানুষ্ঠান হয়।[৩৪] এই শ্রেণীর লোকনাট্যে এক একটি অংশ এক একদিন পরিবেশন করা হয় এবং বিষহরা বা মনসার গানের মত সপ্তাধিক সময় ধরে চলে। মনসার গানের মতই টনসা যাত্রায় অধিকারী বা মূল গায়েন চামর হাতে গান গেয়ে চলেন এবং মধ্যে মধ্যে কাহিনীর কোন কোন অংশ পালাভিনয়ের মত করে দেখানো হয়। পেলা বা দর্শকদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করবার রীতিও মনসা গানের অনুরূপ। তবে টনসা যাত্রায় রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং হনুমানকে দেওয়া মালা দর্শকদের মধ্যে ভাগ হয় এবং যিনি সবথেকে বেশি অর্থ দেন তিনিই পেয়ে যান। অনেক স্থলে রেষারেষি ও মর্যাদার ফলে একশত টাকারও ডাক উঠে থাকে।[৩৫] মঞ্চ শিল্পীদের অঙ্গরচনা ও অলংকরণ টনসা ও আলকাপ উভয় লোকনাট্যেই সমরূপ। তবে টনসা যাত্রার কাহিনী রামায়ণ বা কদাচিৎ রাধাকৃষ্ণ কাহিনীভিত্তিক কিন্তু আলকাপের মধ্যে সমস্ত বিবরণের কাহিনীই থাকতে পারে। উভয় লোকনাট্যেরই পালা অলিখিত থাকে এবং শিল্পীরা আসরে তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ রচনা করে অভিনয় করেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উভয় লোকনাট্যে পালাভিনয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সঙ্গীত পূর্বরচিত ও অনুশীলিত থাকে। তা না হলে বাজনদার দোহারদের সঙ্গে মূল গায়েনের সঙ্গতি বজায় থাকে না।

আলকাপ ও বোলান

মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, নদিয়া জেলার রাঢ় অঞ্চলে বোলান নামে একধরনের লোকনাট্যধর্মী নৃত্য গীতানুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। বোলান গান ছৌ, মাছানি, গম্ভীরার মতই গাজন উৎসব উদ্ভূত।[৩৬] বোলান কথাটির অর্থ ডাক দেওয়া বা বোল দেওয়া।[৩৭] মতান্তরে শব্দটির 'বুলা' ধাতু থেকে উৎপত্তি যার নিকটতম সমার্থক শব্দ হল যাত্রা।[৩৮] বোলান গানের বিষয়বস্তু রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি পুরাণ কেন্দ্রিক। একজন মূলগায়ক

সহ শিল্পীরা সমবেতভাবে ঘুরে ঘুরে গান করে। বোলানগান আলকাপের মত অনুষ্ঠান বা আচার নিরপেক্ষ নয়, নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান বা পূজা উৎসবকে কেন্দ্র করেই বোলান গান হয়। বোলানের বিষয়বস্তু পুরাণ কেন্দ্রিক হলেও সমাজজীবনের ছবি গানের মধ্যে ফুটে ওঠে। বোলানদার যখন গান গায় —

মেঘনাদ বধ করিলি তোরা
কবিলি তারা কাহার মারা।[৩১]

রামায়ণের কাহিনীর অন্তর্গত মেঘনাদ বধের প্রসঙ্গে 'তারা কাহার' আসতেই পারে না। কিন্তু লোককবির কাছে তারা কাহার অন্তর্ভুক্ত না হলেও তারা বাস্তবজীবনে অতি পরিচিত চরিত্র। ঐ নামে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়এগ্রা থানা অঞ্চলে এক শক্তিশালী লেঠেল ছিলেন, তাকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে হত্যা করা হয়। এভাবে লোককবিরা পুরাণের কাহিনীর মধ্যেও সামাজিক জীবনের ঘটনাকে তুলে ধরেন। বোলান গানের মধ্যে পাঁচালী নামে এক ধরনের গান গাওয়া হয়। এর দ্বারা মূল পালার কাহিনীকে শ্রোতার উপযোগী করে পারস্পরিক উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা হয়। এগুলি যেন পালার পরিপূরক। দ্বিতীয়ত সমাজের নানা দোষত্রুটি বিচ্যুতি ইত্যাদি বিষয়ে ব্যঙ্গধর্মী গান এগুলির মধ্যে থাকে। লোকনাট্য আলকাপ ছড়াগান শীর্ষক আঙ্গিকে এই ধরনের উপকরণ থাকে, তবে তা পালা বা কাপের পরিপূরক নয়, তা যেন গম্ভীরার চোর-চোরনীর মত সালতামামী বা রিপোর্টধর্মী।

আলকাপ ও পুতুল নাচ

উঃ ২৪ পরগনা, দঃ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার বেশ কিছু অঞ্চলে কিছু কিছু শিল্পী পুতুলনাচের সঙ্গে যুক্ত। এঁরা নানা উৎসব, পূজা, মেলা উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাসহ অন্যান্য রাজ্যের বাংলা ভাষাভাষির গ্রামাঞ্চলে পুতুল নাচ প্রদর্শন করে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে তিন ধরনেব পুতুল নাচ দেখতে পাওয়া যায় — (১) চব্বিশ

পরগনা জেলার জয়নগর মজিলপুর, হাঁসনাবাদ, ডায়মন্ডহারবারের বড় পুতুল বা কাঠের পুতুল — যেগুলির কাহিনী রামায়ণ, মহাভারত বা অন্য জনপ্রিয় পুরাণকেন্দ্রিক। পালাগুলির মধ্যে দাতা কর্ণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, রামের বনবাস, রাবণ বধ, লবকুশ, ভক্ত প্রহ্লাদ, রাজা হরিশচন্দ্র প্রভৃতি। (২) নদিয়া জেলার বগুলা সহ বেশ কিছু অঞ্চলে উঃ ২৪ পরগনার বসিরহাট, বনগাঁ বিভিন্ন অঞ্চলে তারের পুতুলের কাহিনীব মধ্যে উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও যাত্রার অনুকরণে সামাজিক পালা যেমন, সিঁদুর দিওনা মুছে, লোহার শিকল, হিন্দী ফিল্মের অনুকরণে শোলে, ববি প্রভৃতি দেখানো হয়।[৮০] (৩) আরেক ধরনেব পুতুল দেখা যায়, শোলার পুতুল -- যা ১৯৮৮ সালে ৩রা জুন বারাসতে প্রেসিডেন্সী বিভাগের লোকসংস্কৃতি উৎসবে দেখেছিলাম। মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানা থেকে তারা এসেছিলেন। বিষয়বস্তু ছিল 'নিরক্ষরতার অভিশাপ', পুতুল নাচেব নাটকীয় উপাদান বা নাটকীয়তা প্রসঙ্গে বিদগ্ধ সমালোচকদের অভিমত হল — 'পুতুল নাচ যদিও পুতুলদের দ্বারাই অভিনয় হয় তবুও আঙ্গিক ও প্রয়োগরীতির দিক দিয়ে একে লোকনাট্যের পর্যায়ে ফেলা যায়।'[৪১] পুতুল নাচ ও আলকাপ উভয় লোকনাট্যই আচাব অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ। উভয় লোকনাট্যই বর্তমানে বেঁচে থাকার তাগিদে অন্যান্য মাধ্যমকে কোথাও কোথাও অনুসরণ আবার কোথাও নতুন প্রয়োগরীতিকে আত্মীয়করণ করেছে। তিন ধরনের পুতুল নাচকে যদি একত্রে ধরা যায় তাহলে কাহিনী বা বিষযবস্তুর ক্ষেত্রে লোকনাট্যের পার্থক্যটি বিরাট নয়। উভয় লোকনাট্যের মঞ্চ কিন্তু ভিন্ন উভয় প্রকৃতির। পুতুল নাচের মঞ্চ থিয়েটারের মত একদিকে অবস্থিত এবং সামনের দিকটাই শুধু খোলা। কিন্তু আলকাপের আসর দর্শকবেষ্টিত ও মধ্যখানে চারিদিক খোলা। আলকাপের আসর মধ্যখানে অবস্থিত হওয়ায় শিল্পীদের চারিদিকে ঘুরে ফিরে অভিনয় করতে হয়, কিন্তু পুতুল নাচের আসর একদিকে হওয়ায় পুতুলগুলি সামনের দিকেই মুখ করে থাকে। আলকাপের দলগঠন করতে হলে কমপক্ষে ২০ জন লোকের দরকার। কিন্তু পুতুল নাচের আসর মাস্টারসহ (যিনি বিভিন্ন রকম গলার স্বর করে বিভিন্ন চরিত্রকে নেপথ্যে থেকে রূপায়িত করেন) ৭ - ৮ জন হলেই চলে।

আলকাপ ও গুনাই যাত্রা

বিদগ্ধ লোকনাট্য সমালোচকের মতে বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ও খুলনা জেলায় কৃষিজীবি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 'গুনাবিবির যাত্রা' প্রচলিত। গুনাবিবির যাত্রার কাহিনী কিন্তু একটাই। পল্লী যুবতী গুনাই ও তার প্রেমাস্পদ পল্লী যুবক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু যুবকের সঙ্গতিসম্পন্ন চাচা গুনাই-এর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া কৌশলে ভ্রাতুষ্পুত্রকে দূরে সরাইয়া দিবার জন্য তাহার কারাবাসের ব্যবস্থায় সচেষ্ট হইয়া উঠেন। অর্থের জোরে কিছু গ্রামবাসী ও পুলিশের লোককে হাত করে তিনি যুবককে মিথ্যা খুনের দায়ে হাজতে পাঠাইতে সক্ষম হইলেন। ইহার পর গুনাই দুঃখকষ্টপূর্ণ নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়া লুব্ধ চাচার কুনজর হইতে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করে। পরিণামে যুবক মিথ্যা দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া গুনাই-এর সঙ্গে মিলিত হয়, চাচাকেও তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।[৪৮] আলকাপ ও গুনাই যাত্রায় উভয় লোকনাট্যেরই সংলাপ পল্লীভাষায় রচিত। উভয় লোকনাট্যেই নৃত্যগীতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় এবং পালার গানগুলিতে পল্লী সুরেরই প্রভাব দেখা যায়। উভয় লোকনাট্যেই পুরুষরা স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেন। তবে বর্তমানে আলকাপে কিছু কিছু দলে নারী শিল্পীদের অংশগ্রহণের ফলে নারীশিল্পীরাই নারীচরিত্রকে রূপায়িত করছেন। কিন্তু কাহিনীর দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে গুনাই যাত্রার কাহিনী একটি নির্দিষ্ট রূপকথাকে অবলম্বন করেই রচিত, কিন্তু আলকাপে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

গম্ভীরা, খন, ধাম, কুশান, পালাটিয়া, বিষহরা, পাঁচালি, বোনবাহি, নটুয়া, ব-খেলা, ডোমনি, চোর-চুরনি, লেটো, মাছানি, ছৌ, বনবিবি, টনসা যাত্রা, বোলান, পুতুলনাচ, গুনাইযাত্রা প্রভৃতি বাংলা লোকনাট্যের সঙ্গে আলকাপের আঙ্গিক প্রকরণ প্রয়োগ প্রভৃতি নানা দিক দিয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিটি লোকনাট্যের মত আলকাপের প্রকরণে কাহিনী বর্তমান। গম্ভীরা, বিষহরা, কুশান, বনবিবি প্রভৃতি লোকনাট্যের মত আলকাপ পূজা পার্বণও ধর্মবিশ্বাসের সাথে যুক্ত নয়। লেটো, খন, ডোমনি,

মাছানি, বোলবাহি প্রভৃতির মত আলকাপ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ। প্রায় প্রতিটি লোকনাট্যের মতই আলকাপে আসর বন্দনা আছে। সকল লোকনাট্যের শিল্পী ও দর্শক প্রায় সকলেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে পশ্চাদপদশ্রেণীভুক্ত এবং অধিকাংশ নিরক্ষর বা সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন।

উৎসপঞ্জি

১. গৌরীশঙ্কব ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোকনাট্য সমীক্ষা, পৃঃ ৪৮

২. অজিতকুমার ঘোষ ঃ নাট্যতত্ত্ব পবিচয়, পৃঃ ১৫২

৩. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোকনাট্য সমীক্ষা, পৃঃ ৪৮

৪.ক) আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ লোক সাহিত্য, পৃঃ ২৩১

৪ খ) প্রদ্যোত ঘোষ ঃ লোকসংস্কৃতি গম্ভীরা, পৃঃ ৮৬

৫. মধুপর্ণী, মালদহ জেলা সংখ্যা, ১৩৯২, পৃঃ ৭৬

৬. ফণী পাল ঃ ঐ পৃঃ ৫২

৭. প্রদ্যোত ঘোষ ঃ লোকসংস্কৃতি গম্ভীরা, পৃঃ ৮৬

৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ১৩০

৯. শিশির মজুমদার ঃ নাট্যপালা শতবর্ষ স্মরণিকা, পঃ দিনাজপুর, পৃঃ ৮৬

১০. গোপাল লাহা ঃ লৌকিক সৃজনী, সম্পাদক, সুবোধ চৌধুরী, ১ম বর্ষ পৃঃ ৭৩

১১. ঐ

১২. নৃপেন্দ্র সাহা ঃ লোকশ্রুতি, ১৯৮৬, পৃঃ ৮২

১৩. ঐ

১৪. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোকনাট্য সমীক্ষা, পৃঃ ৫৬০

১৫. শিশির মজুমদার ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, পৃঃ ২৫৬

১৬. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোকনাটা সমীক্ষা, পৃঃ ৫৫৮

১৭. শিশির মজুমদার ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটা, পৃঃ ২৫৭

১৮. গৌবীশঙ্কব ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোকনাটা সমীক্ষা, পৃঃ ৫৫৮

১৯. সাগরচন্দ্র কর্মকার (মূল গায়েন ঃ সুন্দরপুর, থানা ভগবানগোলা, জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ)

২০ সুধীর করণ ঃ পাঁচালি, মাছানি লোকশ্রুতি, ১৯৮৬, পৃঃ ৮৯

২১. শিশির মজুমদার ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, পৃঃ ২

২২. ঐ

২৩. আলকাপ শিল্পী দুঃখু খলিফা, চণ্ডীপুর মালদহ।

২৪ আলকাপ শিল্পী বীরেন্দ্রনাথ রবিদাস, ভাতিয়ান মোড়, সাহাপুর, মালদহ।

২৫. নির্মলেন্দু ভৌমিক ঃ লোকশ্রুতি, ডিসেম্বর, ১৯৮৬, পৃঃ ৫৪

২৬. ঐ

২৭. মানস মজুমদার ঃ লোকশ্রুতি, ডিসেম্বর, ১৯৮৬, পৃঃ ১৯

২৮. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ঃ বাংলাব লোকনাট্য সমীক্ষা, পৃঃ ৫৫৯

২৯. সুধীর করণ ঃ লোকশ্রুতি, ডিসেম্বর, ১৯৮৬, পৃঃ ৯১

৩০. আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বালার লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ১১১

৩১. অজিতকুমার ঘোষ ঃ নাট্যতত্ত্ব পরিচয় (বাংলার লোকনাট্য) পৃঃ ৯২

৩২. সনৎকুমার মিত্র ঃ বাঘ ও সংস্কৃতি, পৃঃ ২১২

৩৩. অজিতকুমার ঘোষ ঃ নাট্যতত্ত্ব পরিচয় (বাংলার লোকনাট্য) পৃঃ ৮২

৩৪. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোকনাট্য সমীক্ষা, পৃঃ ৫৫৭

৩৫ ঐ

৩৬. সুশান্ত দাস, মুর্শিদাবাদের লোকসঙ্গীত বোলান, গণকণ্ঠ ঃ লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, ১৯৮৫, পৃ. ৩১৯

৩৭. ঐ, পৃঃ. ৩২০

৩৮. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ পৃঃ ৫৯৩

৩৯ মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত দাদপুর গ্রামনিবাসী বোলান শিল্পী সনাতন দাসের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

একাদশ অধ্যায়

আলকাপের নির্বাচিত সংকলন

ক) আসর বন্দনা

(১)

মাগো আনন্দময়ী, নিরানন্দ কোরনা
ও মায়ের দুটি চরণ বিনে আমার মান
অন্য কারেও আর জানি না
মাগো আনন্দময়ী নিরানন্দ কোরনা।
ভবানী বলিয়া ভবে যাব চলে
মনে ছিল এই কামনা।
মাগো অকুল পাথারে ভাসালি আমারে
দুঃখ রাশি মোর গেল না।
মাগো আনন্দময়ী নিরানন্দ কোর না।।[১]

(২)

জীবন নদীর জল, ও জল বহে অবিরল

আমার অজ্ঞানতা দূর করো মা

জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো

জীবন নদীর জল...................অবিরল।

মানব আসতে ন্যাংটা যেতে ন্যাংটা

মধ্যখানে কেবল ভেদটা

কবে যাবে এই জীবনটা, কবে আসবে নোটিশটা গো,

জীবন নদীর.............. .....অবিরল।

মাগো যা সাজাইলে সাজতে হোল

এ সাজ পড়তে জনম গেল।

চলরে মন সেজে চল

এ সাজ কবে খুলবে বল!

জীবন নদীর জল. ....অবিরল।

তোমায় ডাকি মা আসবে এস মা

এ আসরে চরণ দেখা ডাকি মা আর এস মা।

বসন পর বসন পর

মাগো বসন পুরো তুমি,

চন্দন চর্চিত জবা, পদে দেব আমি।

বালিঘাটের কালি মাগো কৈলাসকামিনী

বৃন্দাবনের রাধে মাগো গোলক গোপিনী।

পাতালেতে ছিলে মাগো হয়ে ভদ্রকালী

কত দেব দেবতায় করলে পূজা দিয়ে নরবলী।

আবার কার বাড়িতে ছিলে মাগো

কে করেছে সেবা

শিরে দেখি রক্ত চন্দন, পদে রক্তজবা

মাথায় সোনার মুকুট মাগো ঠেকেছে গগনে

মা হয়ে সন্তানের পাশে উলঙ্গ কেমনে।

তোমাব ডানহাতে বরাভয়

বাম হস্তে অসি,

কাটিয়া অসুরের মুণ্ড পরলে রাশিরাশি।

অসুরেরই রক্ত ধারায় গলে মুণ্ডমালা

হেটমুখে চেয়ে দেখ পদতলে ভোলা

আপনি পাগল পতি পাগল আরো পাগল আছে।

এ অধম হয়েছে পাগল চরণ পাবার আশে

চবণ দেখা শরণ দে, অজ্ঞানেবে জ্ঞান দে।।

(৩)

নম বীণাপানি জ্ঞানদায়িনী

শ্বেত শতদল কমলবাসিনী,

বীণা যন্ত্র ধরা তুমি মা সপ্তসুরা

মুনির মনোহরা অজ্ঞান বিনাশিনী

আমরা কজন মিলে নেমেছি আলকাপ দলে

স্থান দিও চরণতলে ওগো মা বীণাপানি।

(৪)

এস গো মা সরস্বতী ডাকি মাগো তোমারে
তুমি না তরালে মাগো কে তরাবে আমারে।
কোথায় গো গণেশ জননী কণ্ঠে বিরাজ তিনি
করজোড়ে ডাকি মাগো এস আজি এই আসরে।[৪]

(৫)

কোথা আছেন গো মা শিবানী হয়ে জগৎ জননী
পড়েছি মা ঘোর বিপদে তরাও গো তারিনী।।
পড়েছি মা ঘোর বিপদে
তাই ডাকি মা করজোড়ে
এস মাগো আজ আসরে
ওগো কুল কুণ্ডালিনী।[৫]

(৬)

মা গো কালী মনের কালি দূর করগো আমার
জ্ঞানের প্রদীপ দাও মা জেলে মুছে যাবে অন্ধকার।।
আমি অতি অভাজন না জানি ভজন, সাধন
স্মরণ করিয়া তোমার রাঙাচরণ
নমি মাগো শতবার
মাগো কালী..............অন্ধকার।।[৬]

(৭)

দীন তারিণী দয়াময়ী কোথা মা তারিণী তারা,
দিবা নিশি ডাকি মাগো তবু কেন পাইনা সাড়া।।
আমি মা তোর অধম ছেলে নেনা মাগো কোলে তুলে
তুই যদি মা দিস গো ফেলে কে তরাবে দুঃখহারা
দীন তারিণী দয়াময়ী................তারা।।
বেদ আগমে শুনেছি মা যে জন ডাকে বলে শ্যামা
কোন ব্যথা রয়নাকো তার আমার হৃদয়
কেন ব্যথায় ভরা।
দীন তারিণী...........................তারা।।
আইনা গো মা কষ্ট মেলে
নেমা একবার কোলে তুলে
বসব আমরা মায়ের কোলে
বাইরে নেত্রে প্রেমধারা।
দীন তারিণী.....................তারা।।[১]

(৮)

কোথায় ওগো সরস্বতী তুই আমারে কর মা গতি
মরণের কি ভয় আছে যা তোর চরণ ধরে মরতে পারি।
তুমি মাগো বীণাপানি কণ্ঠে বসে বলতে বাণী।
সমাজ সাগর পাড়ি দেব বাড়িয়ে দে মা চরণ দুখানি।

নাই কোন সম্বল আছে শুধু ভক্তি বল।
তোমার মাগো বীণার তারে পান জাগায় মোর অন্তরে।
দয়া কর মা শ্বেত ধরণী
আমার যেন হয় মা গতি
করুণাকান্ত কেঁদে বলে রেখ মাগো চরণতলে
তোমাব চবণ করি স্মরণ
না জানি ভজন স্তুতি।"

উৎসপঞ্জি

১ মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার অধীন সুজাপুর ব্রাহ্মণ গ্রাম নিবাসী ওস্তাদ আবুল কাসেমের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

২. মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জ থানার অধীন মালঞ্চা কৃষ্ণনগর গ্রাম নিবাসী ওস্তাদ রামদাস সরকারের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৩. শিল্পী ওস্তাদ আফাজুদ্দিন (বাজারপাড়া, বহরমপুর), মুর্শিদাবাদ চর্চা, সম্পাদক ঃ প্রতিভারঞ্জন মৈত্র, পৃঃ ১৯৯।

৪. ওস্তাদ মুস্তাফা সিরাজ ঃ মুর্শিদাবাদ চর্চা, সম্পাদক প্রতিভারঞ্জন মৈত্র, পৃঃ ১৯৯

৫ ঐ

৬. বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার পাকুড় থানার অন্তর্গত গোপীনাথপুর নিবাসী ওস্তাদ ফুলচাঁদ সরকারের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৭. বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার পাকুড় থানার অন্তর্গত ইলামী গ্রাম নিবাসী প্রধান শিল্পী হরেরাম সরকারের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৮. মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার অন্তর্গত সুন্দরপুর গ্রাম নিবাসী আলকাপ শিল্পী করুণাকান্ত হাজরার কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

খ) বৈঠকি গান

(১)

তোমার মুখের গান বড় ভালোবাসি
বদন তোল কথা বল ওগো প্রিয়সি।
কেন কর মান ও গো বিধুমুখী
তোমার লাগি আমি যোগী সেজেছি।
তোমার মুখের.................ভালোবাসি।।
তোমায় করব বলে খুশি
রঙিন মাথার ফিতে এনেছি।
তোমার মুখের হাসি.............ভালোবাসি।[১]

(২)

বারেক বদন তোল কথা বল ওগো বিনোদিনী
তুমি কিসের তরে করেছ মান বল বল শুনি।
তোমার লাগি যত করেছি আছে তোমার মনে
বৃন্দাবনে হেরি আয়ানে ধরেছিলাম আমি কুণ্ডাকিনী
বারেক বদন তোল...............বিনোদিনী।
নারীর রূপে কেমনে নাই হে দয়া।
নারী যে বড়ই পাষাণী
বারেক বদন তোল....................বিনোদিনী।
মেল হে নয়ন বল হে বসে
শুন শুন ও মানিনী
বারেক বদন তোল.............বিনোদিনী।।[২]

(৩)

ওরে পরান বধুঁ যারে
ওরে পরান বধুঁয়া
পোহাইল বাদল রাতিরে
আমি আজি জাগিয়ারে
মিটি মিটি চাঁদের আলো
দেখছি মেঘের ফাঁকেরে
আমি আজি জাগিয়ারে।
বাহিরের বাদল ঝড়েরে
আমি কাঁদি ঘরে বসিয়া
ওরে পরান বধুঁয়া।।ঁ

(৪)

নাইতে এসে ভাঁটার স্রোতে
কলসী গেল ভেসে।
সেই দেশেতে চলরে কলস
বধু রয় যে দেশে।
নাইতে.............কলসী গেল ভেসে।।
জলকে এসে কাল সকালে
কখন মনের ভুল
তোমার লাগি রইলাম বসে।
নাইতে এসে.........................ভেসে।।
বধুঁ আমার আসবে বলে

পাই খুজে যারে
কলস আমার যাইবে ভেসে
খুঁজে আন তারে।
আমার নয়ন জল নীরে
ধোয়াব বধুঁর পা দুখানিরে
আর কতদিন রইব আমি
যোগিনীর বেশে
নাইতে এসে ভাঁটার স্রোতে
কলসী গেল ভেসে।[৪]

উৎসপঞ্জি

১. বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার পাকুড় থানার অন্তর্গত ইলামী গ্রামের বাসিন্দা ওস্তাদ পঙ্কজভূষণ দাসের খাতা থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

২. ঐ

৩. মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত সুজাপুর ব্রাহ্মণ গ্রাম নিবাসী ওস্তাদ আবুল কাসেমের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৪. মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত দোগাছি গ্রাম নিবাসী শ্যামচন্দ্র দাসের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

গ) দ্বৈত গীত

(১)

পুরুষ ঃ তোমায় আমি কত ভালোবাসি হে প্রিয়সী
এস একবার বসি পাশাপাশি।

নারী ঃ তোমার ওজন করা ভালোবাসা
তার আমি করিনা আশা হে।

পুরুষ ঃ কেন তুমি করো চটাচটি হে প্রিয়সী।

নারী ঃ কেন করো জড়াজড়ি
রাস্তা ছাড় যাব বাড়ি হে।

পুরুষ ঃ পালিয়ে কোথায় যাবা হে প্রিয়সী

নারী ঃ মরা সব ফুরলী ইজ্জত গেল
তোর জুয়ার খেলাতে

পুরুষ ঃ খেলব জুয়া আনব জিতে
ভাবনা কি তাতে।

নারী ঃ জুয়া খেলে বেচলি আমার সোনার গেরস্থালি

পুরুষ ঃ লাজেব কথা বলে আমায় আর লজ্জা দিও না

নারী ঃ থাকলে লাজ এমন কাজ তুমি করতে না।

পুরুষ ঃ তবে কান ধরে করছি কিরা (দিব্যি)
আর জুয়া খেলব না।

নারী ঃ থাকবে প্রাণে প্রাণে মিশায়ে প্রাণ
যেতে দিব না।

(২)

পুরুষ ঃ আমি তোমায় খুঁজে বেড়াই বনে বনে
তবু রাধে দেখা নাই পাই তব সনে।

নারী ঃ কিবা তোমার মনে আছে
এতদিন এলে কাছে হে।

পুরুষ ঃ দেখা আমি পেলাম এতদিনে হে রাধে

নারী ঃ তুমি তো নিঠুর কালা
আমায় তো দিলে জ্বালা হে।

পুরুষ ঃ আমি কি জ্বালা দিয়াছি হে
তোমার প্রাণে হে রাধে।[২]

(৩)

নারী ঃ বধুঁ আসবে বলে কদমতলে
আমায় দিচ্ছ ফাঁকি।

পুরুষ ঃ এই যে এসেছি এসেছি প্রাণ প্রিয়সী
চাঁদ মুখ তোমার আমি দেখি দেখি।

নারী ঃ শয়নে স্বপনে ভাবি মনে মনে
প্রাণ যেন তোমায় সঁপেছি।

পুরুষ ঃ তোমার প্রাণে আর আমার প্রাণে
দুইজনে হবে হে মিশামিশি।[৩]

(৪)

নারী ঃ ছিছি হরি তোমার লজ্জা হল মা
আমার পায়ে ধরে কেঁদেছ হে হরি
সে সব কথা মনে পড়ে না
ছি ছি হরি.....

পুরুষ ঃ তোমায় সতী কে বলেছে তোমায় সতী কে বলে?
অসতীর শিরোমণি তোমায় সতী কে বলে?
রাহু যখন গ্রাস করিবে
তখন জৈবন কারে দিবে
তোমাব মধু পান করিবে বোলতা ভিমরুলে
তোমায় সতী কে বলে?

নারী ঃ এ কলঙ্ক ছাড়া কে আছে জগতে
সবাই কলঙ্কের কলঙ্কিনী।
আকাশের চাঁদ পূর্ণ শশী
তার কলঙ্ক রাশি রাশি
অযোধ্যাতে সীতা সতী
তারও কলঙ্ক হয়েছে
এ কলঙ্গ ছাড়া.....।[৪]

(৫)

নারী ঃ এস নাগর আমার বাড়ি
তোমায় দেব ভালোবাসা

পুরুষ ঃ আমি গেলে পরে তুমি যাবা ভুলে
আমায় দিয়ে কেবল আশা।

নারী ঃ এস এস ওহে প্রাণনাথ
ভুলব না কখনো তোমার কথা

পুরুষ ঃ পঙ্কজ বলেছে ভালো এখন বাড়ী চল
তোমায় আমি করি আশা।[৫]

(৬)

নারী ঃ ওরে দুষ্ট আমি তোরে চিনি
আমায কেন বল কুবচন।

পুরুষ ঃ ওটে মাগী তোবে বলছি
তোরে নিয়ে যাব করে হরণ

নারী ঃ ওরে মরা রাবণ লয়ে ছিল সীতা হরে

পুরুষ ঃ তেমনি করে আমি তোরে
নিয়ে যা বটে মাগী এখন।

নারী ঃ বারে বারে বলি শুন তোরে
রাবণ ঐ কারণে গেল ছারখারে।[৬]

(৭)

নারী ঃ তুমি এলে যদি সখা
এস বস হে আমার পাশে।

পুরুষ ঃ আমি এলাম ধনি তোমার কাছে
হেসে হেসে দুটো কথার আশে।

নারী ঃ শুন শুন ওহে প্রাণ সখা
কেমনে হাসিব আমি
পুরুষ ঃ নিদাগকালে থাকি যেন
তোমার হৃদয় পাশে।[১]

(৮)

পুরুষ ঃ আজ তোরে পেয়েছি নদীর ঘাটে আসি
আমায় তুমি বল এখন স্বামী।
নারী ঃ যদি আমি হইগো সতী
নিয়ে যেতে পারে কার শক্তি হে।
পুরুষ ঃ ও তোর কথা শুনি হাসি
মনে মনে হে আমি
নারী ঃ আমার নাথ দূর দেশেতে তাই
তুমি এসেছ কাছে হে।
পুরুষ ঃ যে সব কথা শুনব নাকো ধনি
নিয়ে যাব তোমায় এখনি।[১]

(৯)

পুরুষ ঃ তোর বাগানে ফুল ফুটাছে সই
ইচ্ছা হয় তোর বাগানের মালি হয়্যা রই।
তোর বাগানের মালি হয়্যা রই
তোর বাগানের চতুর্পাশে

ঘ্যারাছে আইজ দুবড়া ঘাসে
কি করবে শুধু লাঙল চষে
ঘষতেও হবে মই —
তোর বাগানে ফুল ফুট্যাছে সই.....

নারী ঃ ধিক তোমার জীবনে
রাগ কি তোমার নেই মনে
তোমার বহিন ভাই ভাতারী
ভাইকে ধরে স্বামী
ছি ছি লজ্জায় মরি আমি
মুখ দেখাব কেমনে
ধিক তোমার .... মনে।[৯]

(১০)

পুরুষ ঃ চাঁদমুখে তোল কথা বল ওলো পটের ছবি
এমন পুরুষ সারা জনমে কোথায় খুঁজে পাবি।

নারী ঃ পুরুষ হাতির নাই হে মায়া
বিপদকালে তালের ছায়া।

পুরুষ ঃ তুইরে আমার মনের ময়না
তুইরে আমার মনের চাবি।

নারী ঃ যখন তুমি পড় দায়ে
তখন তুমি ধর পায়ে।

পুরুষ ঃ পাপের কথা বললে পরে
নরকেতে যাবি
চাঁদমুখে তোল ..... পাবি।[১০]

(১১)

পুরুষ ঃ আমি খেয়ে নিশা হয়ে বেদিশা
বাড়ি চিনতে পারি না।

নারী ঃ খেয়ে দারু ফুরিয়ে দিলা সুখের গিরস্তালি

পুরুষ ঃ নিজের বাপের ফুরাইনু তাতে তোর কিটে শালি।

নারী ঃ লোকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হল না
নিজের মনে মাতাল হয়ে আজ সেজেছ রাজা

পুরুষ ঃ যে খেয়েছে মদের বোতল
সে পেয়েছে মজা

নারী ঃ পায়ে ধরে বলছি মদ আর খেও না

পুরুষ ঃ কেহ দুধ বেচে মদ খায় তা তুমি জান না
আমি খেয়ে নিশা...চিনতে পারি না।[১১]

(১২)

পুরুষ ঃ সোনার বরণ কইন্যা গো এস আমার সোনার নাইয়ে
চল আমার বাড়ি।

নারী- ঃ ওরে অচিন দেশের বন্ধুরে তুমি
ভিন গ্রামের নাইয়া আমি ভিন গ্রামের নারী।

পুরুষ ঃ গয়না ঢাকাই শাড়ি দেব
ওগো ময়না মতি।

নারী ঃ গয়না শাড়ি দিয়া মন পাওয়া
যায় না কুলবতীর।

পুরুষ ঃ শাঁপলা ফুলের মালা দেব
রাঙা রেশমী চুড়ি।

নারী ঃ মন ভোলানো জিনিস না দিয়া
মন কি দিতে পারি রে বন্ধু
মন কি দিতে পারি

পুরুষ ঃ কোন সে রতন চাওরে কইন্যা
আমি কি তা জানি?

নারী ঃ তোমার মনের বাজ্যে আমি
হতে চাই রাজবানী।

উভয়ে ঃ রইল সাক্ষী তরুলতা
পদ্মা নদীর পানি
ফুল ছাড়িয়া দুটি প্রাণী অকূলে দিলাম পাড়ি।[১২]

(১৩)

পুরুষ ঃ ফুল বাগানে উঠ্যা কেটা
ভাঙছে ফুলের কুঁড়ি
তাইতো আমি এলাম তাড়াতাড়ি।

নারী ঃ মরা কিসের তুই করিস বড়াই
তোকে দেখে কে বা ডরায় রে?

পুরুষ ঃ তোকে ধরে নিয়ে যাব ঐ রাজবাড়ী

নারী ঃ যদি করিস ধরাধরি
মুখে মারবো ঝাঁটার বাড়ি রে।

পুরুষ ঃ সত্য করে বল আমারে
তুমি কার ঘরেরই নারী?

নারী ঃ থাম আমার পুরুষকে ডাকি
কেমন করে বকাবকি রে

পুরুষ ঃ আমি তোরে দিলাম ছেড়ে
করিস না আর চিৎকারী।

ফুল বাগানে উঠ্যা কেট্টা ভাঙছে ফুলের কুঁড়ি
তাইতো আমি এলাম তাড়াতাড়ি।

(১৪)

পুরুষ ঃ কোন রূপসী জলের কলসী
ভরছো বারে বারে
ঢেউ দিও না পালিয়ে যাবে
মাছ চেপেছে চারে

নারী ঃ সারা জনম জলকে আসি ঘাটে
তোর কি এত জোর খাটে রে?

পুরুষ ঃ ও তোর বাপের নাম কি
বলতো টে আমারে

নারী ঃ আমি আছি রাজার মেয়ে
তোর মাথা কাটবে শুনতে পেলে রে

পুরুষ ঃ মিথ্যা কথা শুনাছিস তুই কারে
কোন রূপসী জলের কলসী

ভরছো বারে বারে
ঢেউ দিও না পালিয়ে যাবে
মাছ চেপেছে চারে।[১৪]

(১৫)

দেওর ঃ ওরে সোনার ভাবীরে
কি উপায় করি রে তোর,
সঙ্গে তোর ভাব রাখা দায়
ঘরে আছে বাঘের মত ভাই
তার সামনে পড়লে
আর তো বাঁচা নাই
পিরিতি করে জ্বলে
মলাম হায়রে।
ওরে সোনার ভাবী....
ঘরে আছে মা নানী
আর আছে ছোট বোন
থেকে থেকে রাখে তোরে
ছাড়ে না কখন
ঘরের লোকে দুষ্মন হলে
এড়ানো না যায়
ওরে সোনার ভাবীরে
সঙ্গে তোর ভাব রাখা দায়

ভাবী ঃ ছোট দেওরা তোর আঁজলা কথা

পরানে সয় নারে
পান তো চিরি সুপারির বাহাদুরী
সোনা মুখে তুল্যা দিলে
খায় না রে।
ভাতার গেছে ধান কাটিবারে
তাকে বাঘে ধরে খাক।
আমার সোনার দেওরা
চিরকাল বেঁচে থাক
দেওরার লাগি কলঙ্কিনীর
ঘরে মন রয় না রে
পাড়া পড়শি হল বইরি
হল পথের কাঁটা
শাশুড়ি ননদের মুখে
আমি মারি ঝাঁটা দেওরারে।[১৫]

উৎসপঞ্জি

১. বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার পাকুড় থানার অন্তর্গত ইলামী গ্রামের অধিবাসী ওস্তাদ পঙ্কজ ভূষণের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

২. পূর্বোক্ত ঠিকানার আলকাপ শিল্পী ঠাকুরপ্রসাদ দাশের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৩. একই গ্রামের প্রবীণ শিল্পী হরেরাম সরকারের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৪. মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা থানার বল্লালপুর-লহড়্যা নিবাসী ওস্তাদ আনেসুর রহমানেব কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৫. মালদা জেলার ইংলিশবাজার থানার অন্তর্গত চণ্ডীপুর গ্রাম নিবাসী দুঃখু খলিফার কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৬ মালদা জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত সুজাপুর বামনগ্রাম নিবাসী ওস্তাদ আবুল কাসেমের নিকট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৭. বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার রাজমহল থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর মিশুটোলা নিবাসী ওস্তাদ মকবুল খলিফার কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৮. একই গ্রামের আলকাপ শিল্পী শিস মহম্মদের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৯ মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর, মুকুন্দপুর পদ্মাতীরের নিবাসী প্রবীণ শিল্পী সাজিরুদ্দিনের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

১০. মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা থানার অন্তর্গত চণ্ডীপুর গ্রাম নিবাসী আলকাপ শিল্পী গোপালচন্দ্র মণ্ডলের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

১১ মালদা জেলার কালিয়াচক থানার ভগবানপুর গ্রাম নিবাসী আলকাপ শিল্পী নবেদ আলীর কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

১২. বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার পাকুড় থানার চাঁচকি গোপীনাথপুর নিবাসী আলকাপশিল্পী ফুলচাঁদ সরকার খলিফার কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

১৩. মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জ থানার মালঞ্চা নিবাসী ওস্তাদ রামদাস সরকারের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

১৪. মালদা জেলার মানিকচক থানার রহিমপুর নাকিতোলা নিবাসী প্রবীণ আলকাপ শিল্পী ওস্তাদ নিজামুদ্দিন সেখের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

১৫ বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার তেঁতুলবাড়ি নিবাসী আলকাপ শিল্পী ওস্তাদ হারেজ শেখের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

ঘ) ছড়া গান

আলকাপের সৃষ্টি সম্পর্কে ছড়াগান

তবে শুনুন শুনুন শুনুন সবে
শুনুন দিয়া মন
পঞ্চরসের কিছু কথা করে যাই বর্ণন।
আলকাপেরই সৃষ্টিকর্তা
বোনাকানা নাম
তার মোনা কইসা ধাম
আগেরকালে বাঁশতালাতে
হত এসব গান
এল ঝাঁকসু সরকার কি চমৎকার
দেশে পেল সুনাম
তার চরণে পঞ্চরসের সকলেরই প্রণাম।
প্রণাম কেন হল?
বলতে হল আমায় বিস্তার করে
মুর্শিদাবাদের পঞ্চরসের গান
পৌঁছে দিল ঘরে ঘরে।
তিনি এই সভ্যতা জ্ঞানের কথা
দিলেন সবার কানে
আলকাপ থেকে উন্নতি করে
প্রচার করলে পঞ্চরস নামে।[১]

দেহতত্ত্বের ছড়া

ধূলোখেলায় মত্ত হয়ে রয়েছ ভুলে।
ভেঙ্গে যাবে ভবের বাজার সন্ধ্যা লাগিলে।।
বলে জানাই আমি প্রকাশে
দিনের পরে রাত্রি আসে
জন্ম মৃত্যু মাসে মাসে
আকাশে চলে
ধূলো....লাগিলে।
এই যে ভবের নদী দিবা নিশি বয়
সেই নদীতে কোন মাঝি নৌকাটি চালায়।
কেবা নদী কেবা নৌকা কেবা চড়নদার
কেবা দাঁড়ি কেবা মাঝি কেবা করিবে পার
ঢেউ উঠিলে নৌকা যখন করিবে টলমল
চড়নদারেরা বলে মাঝি সামাল সামাল।।
মাঝি বলে এই তুফানে নৌকায় যাবে যারা
ভাল করে গুণের দড়ি
এঁটে ধরবে তারা
দাঁড়ির তরে বলে মাঝি
রসা বাঁধো কসে
উজান মুখে ধরব নৌকা
তখন দিব ছেড়ে
হাবুডুবু করে নৌকা
ভাবে চড়নদার

এবার বুঝি ডুবে মরব
কূল পাব না আর
ঘূর্ণিতে জলে নৌকা
পাকে পাকে ঘুরে
মাঝি তখন হাল ধরিয়া
কাঁপে থরে থরে।।
দাঁড়ি যারা ছিল তারা উঠিয়া পালায়
মাঝি বলে আর তো নৌকার কূলকিনারা নাই
কি করিবে মাঝি একা
আছেন গো হাল ধরে
একবারেতে ডুবল নৌকা
তখন দিল ছেড়ে।।
ছয়রিপু ছয়জন দাঁড়ি দেখেন বিচার করে
মন পবন মাঝি একা আছেন গো হাল ধরে
নদী যখন শুকাইবে
ধর্ম ধরে গুণের দড়ি
করতে চাহেন পার
দেহের মধ্যে আত্মা তোমার
হয়গো চড়নদার
নদী ছাড়া নৌকা বল চলবে কেমন করে?
নদী যখন শুকাইবে নৌকা থাকবে পড়ে
কোন নৌকা মাটি মধ্যে মাটিতে মিশায়
কোন কোন নৌকাকে আগুনে পুড়ায়।

কলমেরই ঘোড়া বলে
আর না পারি চলিতে
গুরু বলে আরো কিছু
ভেদ আছে তাতে।[১]

(২)

আসি ভবে যেতে হবে করিনু স্মরণ
মায়াজালে আছি ভুলে আখেরে মরণ।
পাঠায়েছ তাই এসেছি
রাখিয়াছ তাই রয়েছি
যেতে হবে দাঁড়িয়ে আছি
জানাই কারণ জানাই সন্ধান সন্ধান
জন্ম-মৃত্যু সমান সমান
এক বিন্দু জল হতে জননী জঠরে
জন্ম দিলেন নিরঞ্জন ভব সংসারে
মায়ের চারি বাপের চারি
খোদার দেওয়া দশ
আঠারো মোকামের মধ্যে খেলছে নানা বস।
জল হতে ফল হয় বলে যাই তোমাবে
খুঁজতে পরে পাওয়া যাবে দেখ ভাল করে।
জলরূপে ফল গিয়ে ফুলেতে মিশায়
দিনে দিনে মায়ের গর্ভে সৃষ্টি শুরু হয়
একমাসে মাংসপিণ্ড লোদেরই মতন

দুমাসে হয় ভাই এই দেহেরই গঠন
তিনমাসে ত্রিভূজ হয় মনুষ্য আকারে
চারিমাসে বসে জীব ধড়ের ভিতরে।
পাঁচমাসে দেহের মধ্যে নড়াচড়া করে
ছয় মাসে ফেরেশতা গিয়ে দেখা দেয় তারে
সাতমাসে সপ্তম রূপ দেহের মধ্যে চলে
আটমাসে আত্মার বাতি দেহের মধ্যে জ্বলে।।
নয় মাসে নবগ্রহ হাড়মাংস ফুটে
দশ মাসে দশ ইন্দ্রিয় দশ জায়গাতে জুটে
অন্ধকারে থাকতে নারে ছটপট করে
দেহ বলে রবনারে এ আঁধার ঘরে
যাব রে বাহিরে।।
এরূপে জন্ম হয় আসি গো সংসারে
গুরু বলে জানাই শিষ্য মৃত্যু কি প্রকারে
বারো মাস থাকতে বান্দার
বারো বুরুজ নড়ে
এগারো মাস থাকতে বান্দার
চন্দ্র নাই ধরে
দশমাস থাকতে বান্দার দশদারি কলম
নয়মাস থাকতে ভ্রমর করেগো গমন
আটমাস থাকতে দেহের অষ্ট আলো জ্বলে
সাতমাস থাকতে জীব সাঁতার দিয়ে চলে

ছয়মাস থাকতে হয় মনচাটন
পাঁচমাস থাকতে হয় যমরাজার তাড়ন
চারমাস থাকতে তোমার চোখে ধরে কম
তিনমাস থাকতে ত্রিবেণী ঘাটে শুখান
দুইমাস থাকতে তোমার ধরে নাহি মন
একমাস থাকতে দেশের শুল হয় হনন
একপক্ষ থাকতে দুনিয়া ভাল নাহি লাগে
বারো দিন থাকতে তোমার ছয়রিপু জাগে।
এগারো দিন থাকতে তোমার
ঘুরে উঠে মাথা
দশদিন থাকতে তোমার
ভুল হয় কথা।
নয় দিন থাকতে আঠারো মোকাম নড়ে
আটদিন থাকতে জীব উদাস হয়ে ঘুরে
সাতদিন থাকতে জীব সাঁতার দিয়ে যায়
ছয়দিন থাকতে তোমার দিক বিদিক নাই।
পাঁচদিন থাকতে তোমার পঞ্চইন্দ্রিয় কাঁপে
চারদিন থাকতে চোখে বড় কম দেখে
তিনদিন থাকতে জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়
দুইদিন থাকতে দুনিয়ার মারা আর নাই
একদিন থাকতে নাহি চিনে আত্মপর
দুঘণ্টা থাকতে নাচাইবে আবার

এক ঘণ্টা থাকতে থাকতে সব হবে বিস্মরণ
খালি পিঁজরা পড়িয়া রহিবে গো তখন।
মাতা কাঁদে পিতা কাঁদে ভগ্নী ভাই
তোমরা কেন কাঁদ মিছে আমি আপন দেশে যাই।
যাইবার কালে পিঁজরাকে চারিকথা বলে
অতএব সেই কথা আমি জানাই গো সকলে।
দ্বিতীয় যোগের কথা ডাকি
রইশোয়া
ওঠো হে সাধুর বালা খাও বাটাব গুয়া
দিনকয়েক ছিলাম আমি তোমার ভিতরে
তোমারে ছাড়িয়া যাই তুমি রইলে পড়ে।
আমি চলে যাই চলে যাই
কে কোথায় রয় ভাই
নেজামুদ্দিন বলে ভোজের বাজি
রঙ তামাশায় রইলাম মজি
সাধু সন্ত হাজি গাজী যাবে সর্বজন
আসি ভবে যেতে হবে করিনু স্মরণ।[৮]

শিবের ছড়া

ওহে কে বলতে পারে ভোলা তোমার লীলা
লীলাকাবী বংশীধারী জলেতে ভাসে শীলা
ওহে ভোলা তোমার লীলা কে বুঝতে পারে।
সন্ন্যাসী রূপ ধারণ করে ঝোলা ল্যাও হে ঘাড়ে।

ঝোলা ঘাড়ে লিয়া তুমি দ্বারে দ্বারে যাও
লজ্জা কি লাগে না তোমার ভিক মেঙ্গে খাও।
তোমার শ্বশুর দক্ষ রাজা যজ্ঞ করেছিল
তেত্রিশ কোটি সকল দেবতা নিমন্ত্রণ পাইল।
তোমায় কেন নিমন্ত্রণ দেয় না দক্ষরাজে
বিনা নিমন্ত্রণে তুমি যাবে কোন লাজে।
আদ্যাশক্তি ভগবতীর দুঃখ হইল ভারী
তোমায় নিমন্ত্রণ না দিল কেন ত্রিপুরারী।
ভাঙ ধুতুরা খেয়ে তুমি পড়ে থাক শ্মশানে
কুচনি পাড়ায় খেলা কর লজ্জা নাই মনে।
এই কথা শুনে ভোলা রাগে কম্পমান
তালবেতাল হয়ে গেল জগৎময় স্থান।
রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ভোলা
ভগবতীকে কাঁধে তুলিল
সঙ্গে সঙ্গে জলস্থল
উথাল পাথাল হইল
সেনা দেখে চক্রপাণি চক্রেতে কাটিয়া
ভগবতীর দেহকে দিল খণ্ডিয়া
সেসব খণ্ড হিসেব মত একান্ন খণ্ড হয়
একান্নটি খণ্ড সতীর একান্ন জায়গায় পড়ে
সেই জায়গাগুলি একে একে মানুষ তীর্থস্থান গড়ে
ওহে কে বলতে পারে ভোলা তোমার লীলা
লীলাকারী বংশীধারী জলেতে ভাসে শীলা।[৮]

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার ছড়া

দেশের নেতা গো পল্লীবাসীর বুকের ব্যথা গেল না।
সবাই পেল স্বাধীনতা আমরা কেন পেলাম না।
ভারত স্বাধীন আমরা স্বাধীন
কানে শুধু শুনতে পাই
খুঁজতে গেলে বুঝতে নারি
স্বাধীন কি তোর আখার ছাই।
দেশের নেতা আছে যারা,
তারাই তো সব মানুষ মারা।
সর্বদাই সে চেষ্টা করে
আপন লিয়া
নেতারা তাই যুক্তি করে
যায় শহ্‌রে
পল্লীকে ছেড়া
পল্লীর ঘরে ঘরে ঘটল রে কি যন্ত্রণা
সবাই পেল স্বাধীনতা ...... পেলাম না।
বাবুরা পাউডারেতে দন্ত মাজে
মুখ মুছে তইলাতে
আমরা চোখের জল মুছি
ছেঁড়া চটের থইলাতে।
বাড়ির পাশে ডোবা হলে

কচুরিপানা হাতে ঠেলে
মোরা পায়ের কাদা ধুয়ে ফেলে
মুছবার করি ভাবনা
দেশের নেতা গো....... পেলাম না।

পাখির ছড়া

ওকি হায়রে শালার পাখি
পাখি মারব বলে গাছের তলে
ফাঁদ পেতে বসে থাকি
বাবুই ফুদকি আর তোতা
তাদের তো খুব ছোট মাথা।
ফিঙা বুলবুলি আর মুনিয়া
দেখছে তারা তামাম দুনিয়া।
পাখি হাজার মেরে ভরিব বস্তা
চামচিকা মেরে করিমু শিক্ষা
চোর চুন্নি আর পেঁচা
সব ধরে ভরিব খাঁচা
হাঁড়ি ওল নারিওল গুলা
মেরে ভরিব ঝোলা
একপাখি সাত ভেইয়া
তাকে ধরি ধেইয়া ধেইয়া।
একপাখি বট্টোহোর

শালা বড় কঠিন চোর

কাছে হতে য্যাইছে উড়্যা

তাকে ব্যাড়াওনা ধুড়্যা

মেরেছি দাদা দুই পাখি

ময়না আর চখাচখি

হাড়গিল্লি গিধনি চিল

তার চোখে নাইকো শিল।

কাউয়া বোগলা পীতরাঙ্গা

আরা যেখানে থাকে মাছবাঙ্গা

ঘুঘ্ ময়না টিয়া সে সবকে ফাঁকি দিয়া,

বাদুড় তো দিনে ঝুলে

তোমবা তা দেখ সকলে

তুলা ফুদকি কাটঠুকরা

তাকে তো ভাই হাতে ধরি

টিট্টিহি আর হাঁড়িচাঁচা

কথা বলিছে ছ্যাঁচা।

কবিতর আর ময়নারে

থাকে ভাই এক পিঞ্জরে।

লুহুকি আর ডাহুক্যা

কথা বলিছি পাক্কা

পানি ডুবকি বন মুবগী

খ্যায়া ভাল হয়েছে রুগী

শ্যামকেল আর চুরকা
খাবিতো যা ফরাক্কা
বতকার দেখ হাঁসে
তারা পানিতে সুন্দর ভাসে
মুরগা মুরগী ম্যারা দাদা
ববকে দিয়ে থাকি
ওকি হায়রে.... ফাঁকি।[৮]

চুলকানির ছড়া

মইলাম মইলাম হে চুলকানির জ্বালাতে আমি
উছছে যে গো ফুসড়ী ফুসড়ী
ঠিক যেন মটর মুসরী
আবার দু এক জনা হতেই
ঘিরে নিচ্ছে গোটা বাড়ি
দাদা গো কিবা উপায় করি।
আমি গো বলি উপায়ের কথা
কত খেলাম নিমের পাতা।
কত চন্দ্রমূলে জড় খাইলাম
গাঁবিলার তরকারি
তবুও গেল না সুড়সুড়ি
দাদা গো কিবা উপায় করি।
কত খেলাম ট্যাবলেট

আর লাগালাম মহলম
তাতেও হল না একটু নরম।
শেষে রামপ্রসাদ সিং বলেছিল
খাঁটি সরিষার তেল মাড়িয়া দিয়ো একটু হিং
ওতেও মরল ঘোড়ার শিং।
আবার সরমা চাচি বলেছিল
গরুর খিঁচ লাগাতে।
আমি মইলাম মইলাম
চুলকানির জ্বালাতে।
চুলকানির কত জোর
ছোট ছ্যাল্যা কবলে ওড়।
চুলক্যাতে চুলক্যাতে তারা হয়েছে কাতর।
দাদাগো আরেকটা খবর
ছোট ছ্যালার পুঠঠা ফুল্যা গিয়াছে
পারে না মুতিতে
আমি মইলাম মইলাম হে চুলকানির জ্বালাতে।"

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ক ছড়া

আমরা ভাই হিন্দু মুসলমান
এক মাটিতে বাস করি, একই সুরে গাই গান
আমরা হিন্দু মুসলমান।
হিন্দু যারে জল বলে মুসলমানে কয় পানি।

হিন্দু যারে দিদিমা বলে মুসলমান বলে নানি।
হিন্দু যারে লবণ বলে মুসলমানে কয় নুন
হিন্দু যারে রক্ত বলে মুসলমানে কয় খুন।
একই রক্ত একই মাংস একই ফল জল
তবে কেন ভায়ে ভায়ে হবে রে চঞ্চল।।[৮]

উৎসপঞ্জি

১. বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার তেঁতুলবাড়ি গ্রামের আলকাপ শিল্পী হারেজ সেখের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

২. মালদা জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত পঞ্চানন্দপুর গ্রামের প্রবীণ শিল্পী দেবেন্দ্রনাথ বসাকের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৩. মালদা জেলার মানিকচক থানার রহিমপুর নাকিটোলা গ্রামনিবাসী ওস্তাদ সেখ নিজামুদ্দিনের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৪. মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা থানার লহড়্যা গ্রাম নিবাসী খলিফা আনিসুর রহমানের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৫. মালদা জেলার মানিকচক থানার রহিমপুর নাকিটোলার ওস্তাদ কলিমুদ্দিনের কাছ থেকে লেখকের দ্বারা সংগৃহীত।

৬. বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার পাকুড় থানার ইলামীর পঙ্কজভূষণ দাশের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৭. মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘির মীর্জাপুর গ্রাম নিবাসী তরুণ আলকাপ শিল্পী প্রাণবন্ধু দাশের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৮. বিনয় ঘোষ - শিল্পী ওস্তাদ ঝাঁকসু ঃ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি; ৩য় খণ্ড; পৃষ্ঠা-৭২।

৬) কাপ

(১)

জামাই আনার কাপ

স্ত্রী ঃ জামাই আনা আশা করি আমি মনেতে
যাওনা হে নাথ জামাই আনিতে।
জামাই না আনিলে পরে
রইব না তোমার ঘরে
লোকেতে নিন্দা করিছে।

স্বামী ঃ জামাই আনার কি গুণ আছে বলি তোমারে
প্রিয়সী তুমি বুঝিবে পরে।
তোমাব কথা শুনে ভাবনা হচ্ছে মনে
একদানাও নেই যে আমার ঘরে।
(এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে প্রচন্ড বচসা)

স্ত্রী ঃ তোর কথা শুনে মোরা গায়ে এল জ্বর
তোর মুখেতে আগুন দিয়ে যাব বাপেব ঘর।
তুমি মবা পাঁজি ফাঁকি দিচ্ছ রোজই
মন টিকলো না তোর বাড়িতে
জামাই আনা আশা করি মনেতে।
মরা রব না রব না তোর ঘরে
জামাই না আনিলে পরে।

স্বামী ঃ সুন্দরী তোমার হাতে আমি ধরি
আমারে একা ফেলে যেওনা ছাড়ি।

স্ত্রী ঃ মরা তুমি আমার একটাও কথা শুননা
ভালো করে বেঁচে খাওয়াব আমার গায়ের গয়না।

স্বামী ঃ মাগীটে বছরকার হাল তুইতো জানিস না
চোর ব্যাড়াইছে বাড়িতে বাড়িতে খববতো রাখিস না।

(শেষ অবধি স্ত্রীর কথায় সম্মত হয়ে গেল। জামাই আনতে বেহাই বাড়িতে গিয়ে বেহাইকে উদ্দেশ্য করে সে গান ধরেছে) —

বেহাই আছ বাড়িতে
জামাই এলাম নিয়ে যেতে
জলদি করে দাও বিদায় করে
এলাম তোমার বাড়ি জামাই নিয়ে যাবার তরে।

বেহাই ঃ তোমার জামাই নাইকো বাড়িতে
গিয়েছে ধানের ক্ষেতেতে
ছেলে এখন যেতে পাবে না
ছেড়ে জমির ধানে ছেলে যাবে হে কেমনে
জল বিনে ধান তো বাঁচে না।

মেয়ের বাবা ঃ বেহাই তুমি আমার কথা শুন না
জামাইকে ল নিয়ে গেলে
তোমার বেহান বাড়িতে ঢুকতে দেবে না
বেহাই জামাইকে একবার পাঠাও না।

ছেলের বাবা ঃ তুমি আমার কথা শুনোনা
তোমার জামাই এখন যেতে পাবে না।
একথা তুমি বেহানকে বুঝিয়ে বল না।

(বাধ্য হয়ে জামাই ছাড়া ফিরে এল এবং স্ত্রীকে সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলল)[১]

(২)

দ্বিতীয় বিবাহের কাপ

মেয়ে ঃ নির্দয় হল পিতামাতা
মম প্রতি নাই মমতা
এ জীবন বৃথা রাখা আমার হে।
বৌদেরকে মা বাসেন ভালো
মাখতে দেন সুগন্ধি তেল
পরতে দিচ্ছে পাটাম্বর শাড়ি হে।
আমার মাথায় উড়ছে ধূলো
জুটে না সরষের তেল
পড়তে দিচ্ছে সাদা মোটা খদ্দর হে
এ জীবন................আমার হে।।
বৌদেরকে মা দিচ্ছেন খেতে
মাছ মাংস পুরে বাটিতে
দধি মাখন আর খির হে
আমার জন্য আতপ চাল
খেয়ে তৃপ্তি হয় না মন

আগুনে দহিছে পরাণ হে।

মা ঃ বেটি কি দুঃখ হয়েছে গো বল শুনি
কেটা তোমায় বলেছে কটু বাণী।

মেয়ে ঃ মাতা কি হবে বলিয়া তোমার কাছে
মা হয়ে দুই নজর কর আমার পরাণ ফাটিছে গো
মাতা পরাণ ফাটিছে।

মা ঃ বেটি হয়ে বিধবা মাছ মাংস খাওয়া
তোমার নিষেধ সংসাবে
সেই জন্যেতে দিনা খেতে আমি সংসারে

মেয়ে ঃ আমার দিয়ে দাও বিয়ে
বিধবা হয়ে আমি থাকব কতদিন
দিবানিশি ভাবতে ভাবতে শরীর হল ক্ষীণ।

মাঃ বিয়ে দেবার হলে বেটি বলতে আর হত না।
বিধবা হলে নারী আরতো বিয়ে হয় না।
লিখেছে বেদ পুরাণেতে
আতপ অন্ন হবে খেতে
করতে হবে একাদশীর উপাস
তবে হবে পাপের বিনাশ
মাছ মাংস ভোজন করলে
ওরে বাছাধন কার রিপু জড়িয়ে ধরে
তুই তখন মুক্তি পাবি নারে।

মেয়ে ঃ দ্বিতীয় বিয়ে আর হবে না বা কেন
বেদ পুরাণে দ্বিতীয় বিয়ের দিয়ে যাব প্রমাণ
ত্রেতাযুগে বলীরাজার নারী তারা সতী
দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছিল সুগ্রীবেরই সাথে।
রামের সঙ্গে যুদ্ধ করে মরিল রাবণ
তার নারীকে বিয়ে করল রাজা বিভীষণ।
বিচিত্রবীর্য রাজা যক্ষ্মারোগে মারা গেল
তাব নারীকে ব্যাসদেব নারী হিসাবে নিল।
আরো আরো কিছু কথা আমি বলে যাই
দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল শান্তনু রাজাই।
একের পঞ্চস্বামী কোন দেবীর হয়।
দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী মিথ্যাকথা নয়।
বাধা সতীর পতি কৃষ্ণ বিখ্যাত সংসারে
দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল আয়ান ঘোষেরে।
এইভাবেতে দ্বিতীয় বিয়ে অনেকই হয়েছে
সংক্ষেপেতে আমি বলিলাম তোমাব কাছে।

মা ঃ (মেয়ের যুক্তিতে রাজী হয়ে)
আমি কবি মিনতি দশের প্রতি
অনুমতি দাও আমায়
দিব কিনা দ্বিতীয় বিযে
বেটিব কথায

(বিধবা মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে রাজী হয় না। শেষ পর্যন্ত এক পাগলের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়)।

মেয়ে ঃ মাগো মরার বাড়ি আমি আব যাব না
যেতে আমার মন সরে না
তোরা কি পাগল হলি
খ্যাপার সঙ্গে বিয়ে দিলি
চোখ থাকতে কি মা হলি কানা
যেতে আমার মন সরে না
মাগো মরার বাড়ি ..... মন সরে না।

মা ঃ বেটি অদৃষ্টে তোব যা হবার হয়েছে
খণ্ডাবার আর কে বল আছে?
চুপ বেটি কাদিস না আর
চোখ তুলে দেখ সারা সংসার।।[২]

(৩)

সাউজির কাপ

একটি ছেলের নাম ল্যালহা। বিয়ে করেছে কিন্তু সংসার চালাতে পারে না। বৌ কিন্তু মুখরা। মধ্যে মধ্যেই স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া হয়। একদিন ঝগড়া হতেই স্ত্রী তার স্বামীকে অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

অন্যদিকে এক সাউজির সঙ্গে তার স্ত্রীর ঝগড়া হয়, কার বুদ্ধি বেশি নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় কার বুদ্ধি বেশি হতে পারে প্রমাণ হবে। একথা ঠিক হবার পর বাড়ি থেকে কিছুদূরে তারা মিষ্টির দোকানে চলে আসে।

ল্যালহা সাউজির দোকানে এসে মনের দুঃখে কাঁদছে আর খেতে চাইছে।

সাউজি তখন বলছে — তোর কি হয়েছে?

ল্যালহা — আমার স্ত্রী আমাকে দেখতে পারে না।

আমার বুদ্ধি নেই আমি খাওয়াতে পারি না বলে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।

সাউজি — তুই চালাক হবি?

ল্যালহা — হব, কিন্তু আমি তো ল্যালহ্যা। আমি কি আর চালাক হতে পারব?

সাউজি — হ্যাঁরে হ্যাঁ পারবি। খুব পারবি। তোকে আমি চালাক কর্যা তবে ছাড়ব।

এই বলে সাউজি ল্যালহার হাতে পাঁচ টাকা দিল এবং বলল পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর এই তিনদিকে গিয়ে টাকাটা খরচ করবি। কিন্তু দক্ষিণ দিকে যাবি না।

ল্যালহা ভাবল আমাকে সবদিকে যেতে বলল কিন্তু দক্ষিণ দিকে যেতে নিষেধ করল কেন? সে রহস্যের বশবর্তী হয়ে দক্ষিণ দিকেই গেল।

সে তার হাতের টাকাটা নিয়ে ওলটপালট করছে আর রাস্তা হাঁটছে। এই দৃশ্য অদূরে সাউজির স্ত্রী দেখে ফেলে। সে বোকা ভেবে ল্যালহাকে বাড়ি ডেকে নিয়ে আসে এবং কিছু খাবার খেতে দেয়। ল্যালহা হলে কি হবে বাবুর কিন্তু খাবার পরে পান চিবানো চায়। সে সাউজির বউকে পান দিতে বলে। হঠাৎ দরজার কড়া নড়ার শব্দ। সাউজির কণ্ঠ।

সাউজির স্ত্রী বড় বিপাকে পড়ে কি করবে কিছু ভেবে পায় না। তখন

সে বুদ্ধি করে ল্যালহাকে খালি কুঠির (ধান রাখার বড় ধরনের মাটির পাত্র) ভিতরে লুকিয়ে দেয়।

সাউজির স্ত্রী সাউজিকে খাবার খেতে দিল। খেয়ে উঠার পর সাউজির স্ত্রী দুটো পান সাজল। একটি পান সাউজিকে খেতে দিল, আরেকটা পান সাউজির হাতে দিয়ে বলল, তুমি তো বলতে তোমার ছোটবেলায় হাতের মাপ ভাল ছিল। দেখি তুমি পানটা কুঠির মধ্যে কেমন করে ফেলতে পার। সাউজি স্ত্রীর কাছে নিজের দক্ষতা প্রকাশ করার জন্য ঠিক ঠিকভাবে কুঠির মধ্যে পানটা ভরে দিল। ল্যালহাও পান পেয়ে খুব খুশি। তারপর পান চিবোতে চিবোতে সাউজি চ াল দোকানে।

সাউজি বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই সাউজির স্ত্রী ল্যালহাকে কুঠির ভেতর থেকে বার করে। তারপর কিছুক্ষণ পর ল্যালহা চলে আসে সাউজির দোকানে। সাউজিকে সে তার দেওয়া পাঁচ টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছে। সাউজি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করল — তুই কি সারাদিন কিছু খাসনি যে আমাকে পুরোটা টাকা ফেরত দিচ্ছিস।

ল্যালহা তখন তার পুরো বৃত্তান্ত বলল। এটা শুনে সাউজির ভীষণ রাগ। সে চোরকে হাতে নাতে ধরার চেষ্টা করল। সাউজি পরদিন ল্যালহাকে দশটি টাকা দিয়ে বলল আজ তুই আবার সেই বাড়ি যাবি।

ল্যালহা তাতেই সম্মতি জানাল। ল্যালহা পরদিন সাউজির বাড়ি গিয়ে সাউজির স্ত্রীকে বলছে আজকে আমাকে মাংস ভাত খাওয়াতে হবে। সাউজির স্ত্রী মাংস ভাতের আয়োজন করতে লাগল। মাংস-ভাত যেই খাওয়া হয়েছে অমনি সাউজির গলার শব্দসহ কড়া নাড়া। দরজা ভাঙার মত অবস্থা। তাড়াতাড়ি সাউজির স্ত্রী তখন ল্যালহাকে ছাদের ওপর তুলে দেয়। সাউজির স্ত্রী দরজা খুলল। সাউজি ঢুকেই একে একে সবকটা কুঠির ভিতর দেখছে।

সাউজির স্ত্রী সাউজিকে বলছে—তুমি ওভাবে কুঠি দেখছ কেন?

সাউজি --- জানিস কম দামে অনেকটা ধান কিন্যা ফ্যালাছি। ধরবে কি-না তাই দেখছি।

এদিকে ল্যালহা ছাদের উপর থেকে বিকৃত স্বরে জল খাব জল খাব বলে চিৎকার করছে, সাউজি তখন বলছে ছাদের উপর থেকে জল খাব জল খাব বলে কে চিৎকাব করছে? তখন স্ত্রী বলছে --- তুমি তো ছিলে না, তুমি তো ছিলে না তোমার বাবা যখন মারা যান মুখে জল দিতে পারিনি, তাই প্রত্যেকদিন আত্মাটা ওইভাবে এসে চিৎকার করছে।

সাউজি তখন স্ত্রীকে বলছে বলতো কি বিপদ? বাবাতো তাহলে বাড়ি ছাড়বে না। প্রত্যেকদিন এসে এভাবে জ্বালাতন করবে।

স্ত্রী তখন সাউজিকে পরামর্শ দিল, তুমি নিচের দিকে তাকিয়ে উপরে জলটা বাড়িয়ে দিলেই বোধহয় বাবা খুশি হয়ে বাড়ি ছাড়বেন।

স্ত্রীর পরামর্শ মত কাজ। ল্যালহা জল পেয়ে সন্তুষ্ট। সে তখন ছাদের কার্নিস দিয়ে নেমে বাড়ির পিছন দিয়ে সোজা দোকানে। সেখানে সে মনের আনন্দে বসে আছে।

সাউজি গিয়ে তাকে বলছে, তোকে সেই বাড়িতে যাতে বললাম তুই যাইসনি?

ল্যালহা --- হ্যাঁ গেলছিনু।

সাউজি — কি হল বল?

ল্যালহা তখন সেই দিনকার সমস্ত ঘটনা খুলে বলে।

সাউজির শুনে খুব রাগ হয়। সে ভাবল সত্যিই তো তার স্ত্রী তাকে বোকা বলবে। তার স্ত্রীতো বারে বারে তাকে এভাবে বোকা বানাচ্ছে। কিন্তু

সেও পিছুপা হবার পাত্র নয়। সে যেমন করেই হোক ল্যালহাকে হাতেনাতে ধরে তার স্ত্রীকে দেখিয়ে দিতে চায় যে তার স্ত্রীর থেকে তার বুদ্ধি বেশি। সাউজি এই পরিকল্পনা করে ল্যালহাকে পবদিন সকালে ২০ টাকা দিল এবং সেই বাড়িতে যেতে বলল।

ল্যালহা যেই বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল, পিছনে পিছনে সাউজিও চলল এমন দূরত্ব বজায় রেখে। ল্যালহা বাড়িতে ঢুকল। তার মিনিট খানেক পরেই আবাব সাউজির গলার শব্দ। সাউজির স্ত্রীতো বড চিন্তায় পড়ল। কাছেই ছিল একটা পুরানো বাক্স, তার মধ্যেই সে ল্যালহাকে ঢুকিয়ে দিল।

সাউজি বাড়িতে ঢুকল। ঢুকেই তার স্ত্রীকে বলছে, "তোব এই বাড়িতে কোন দাবি আছে? স্ত্রী-এটা তোমার বাবার বাড়ি এতে আমার কি দাবি আছে? তুমি দিলে দাবি না দিলে দিলে কিসের দাবি?

সাউজি — আমি ঘরে আগুন লাগাব।

স্ত্রী — তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে তুমি আগুন লাগাবে।

সাউজি — হামার মন।

এই কথা বলে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

তখন স্ত্রী বলছে — তোমার যা জিনিস আছে তুমি পোড়াও আমি কিছু বলব না। কিন্তু হামার বাপের বাড়ির দেওয়া বাক্সটা বার কর। তাতে আমার ছোট বেলাকার সব খেলনা পুতুল আছে।

সাউজি বাক্সটা বের করে দিল।

সাউজি ল্যালহাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে ভেবে তার মনে আনন্দ ধরে না। কিন্তু আরেকটা ভাবনা, তার স্ত্রী থাকবে কোথায়? তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ি রাখতে যায়। মাথায় বাক্সটা নেয়। বাক্সটা বেশ ভারী।

সাউজি — হ্যাঁরে বাক্সটা এত ভারী কেন?

স্ত্রী — ভারী হবে না? এত সব লোহার পুতুল খেলনা রয়েছে। তার জন্য ভারী লাগছে।

কিছুদূর যাবার পর ল্যালহার বাক্সের মধ্যে প্রসাব লেগেছে। তখন সে নিরুপায় হয়ে বাক্সের মধ্যেই সেই কাজ সমাধা করেছে। বাক্সের তলা বেয়ে সাউজির মাথায় পড়েছে।

সাউজি তখন তার স্ত্রীকে বলছে — হাঁরে হামার মাথায় জল কিসের পড়ছে?

স্ত্রী — ওগো তুমি আর আমি একবার গঙ্গাস্নানের মেলায় গিয়েছিলাম না। সেই খ্যান থ্যাক্যা সাগরের জল এ্যানা শিশিতে কর‌্যা বাক্সে র‌্যাখ্যাছিলাম। তাই হয়তো উল্ট্যা গেছে।

জলটা নিচে পড়লে তো পাপ হবে, এই ভেবে সাউজি তা জিভ দিয়ে লেহন করতে লাগল।

সাউজি — হেরে নুনছা লাগছে কেনে?

স্ত্রী — সাগরের জল নুনছা হোবে না?

সাউজি — আর গন্ধ কেনে?

স্ত্রী – এতদিন হয়্যাছে ওই জন্য গন্ধ লাগছে।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গিয়ে সাউজিকে তার স্ত্রী বাক্সটা খুলতে বলল। খুলে দেখে ল্যালহাকে। সাউজির লজ্জায় মাথা অবনত হয়ে এল। নিজের বুদ্ধিহীনতার কথা তার স্ত্রীর কাছে স্বীকাব কবে নিল। এদিকে ল্যালহাও বাড়ি ফিরে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে লাগল।[৫]

(৪)

মোড়ল হওয়া কাপ

বড়ভাই ছোট ভাইকে মাঠে চাষ করতে যেতে বলল। ছোটভাই দাদার কথামত মাঠে গেল এবং দাদাকে বলল, মাঠে যেন তাড়াতাড়ি লাহরী (জল খাবার) যায়।

বড় ভাই বাড়িতে এসে বৌমাকে লাহরী করতে নির্দেশ দিল। কিন্তু ছোট বউ ভাসুরের নির্দেশ মানে না। তখন ভাসুর গানের সুরে বউমাকে বলে —

ভাসুর ঃ মাগী কিসের জোরে
বসে আছিস ওরে
তোর ভাত পাক কে করে?
মাগী ভয় নেই কি তোরে?

বউমা ঃ কেন বেশি কথা বল
শুনে গাটা জ্বলে গেল
ভাত রাঁধতে পারব না
তুমি অন্যায় বোলো না।

ভাসুর ঃ অন্যায় বলছি হামি
বলতো মাগী কিসের লাগি
করিস এত জোর
এলে স্বামী বলব হামি
সকল কথা তোর
ম্যার‍্যা ভাঙ্গিবে পাঁজর।

বউমা ঃ এই কথা শুনে রাগ হয় মনে

সইতে পারি না

এলে বলব হামি

মোড়লেই পাবি না।

মুখ লাড়িস না।

ভাসুর ঃ মাগী ভয় নাই তোরে?

মোড়লেই কে নিতে পারে?

ভাইয়ের জন্য মাঠে খাবার যায়নি। ভাইতো রেগে খুন। এদিকে বউও তার কান ভারী করেছে। এক কথায় ছোট ভায়ের মেজাজ খারাপ, সে তার দাদার কাছে মোড়লী চাইল। দাদা কিন্তু সহজেই রাজি হয়ে ভাই ছেঁছড়ুর হাতে মোড়লী তুলে দিল।

কয়েকদিন পর জমিদারের সিপাই এসেছে মোড়লকে ডাকতে। ছেঁছড়ু তখন বলল যে, তার বড় ভাই মোড়ল নয়, সেই বাড়ির মোডল বা কর্তা। সেপাই তখন তার কাছেই খাজনা চাইল। ছেঁছড়ু কিন্তু খাজনা দিতে পারল না। তখন তাকে ধরে নিয়ে গেল জমিদারের কাছারি বাড়িতে।

খাজনা না দেবার জন্য তাকে জমিদার অর্থ দণ্ড দিল এবং শারীরিক নির্যাতনও হল।

অবশেযে বড়ভাই টাকা পয়সা দিয়ে ভাইকে জমিদারের কাছারি বাড়ি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। তখন ছোট ভাই মোড়লীর তিক্ত অভিজ্ঞতা পেতে তার বড় ভাইকে পুনরায় বাড়ির কর্তৃত্ব তুলে দিল।[৬]

(৫)

কাপের নাম — কার ছেলে বিচার

স্বামী স্ত্রীকে বলল ভাত বান্না করতে। সে ভাত খেয়ে হাটে যাবে। কিন্তু তার স্ত্রী বলল যে তার শরীর খারাপ। সে রাঁধতে পারবে না। ঘরে যে পান্তা আছে, তাই খেয়ে হাটে যেতে বলল। কিন্তু স্বামী তার কথায় অনড়। শুরু হল বচসা। স্বামী রাগের বশবর্তী হয়ে হাঁড়ি উনুন সব ভেঙ্গে দিল এবং বৌকে তালাক দিল।

স্বামী চলে গেল হাটে। বৌও এক নতুন আশ্রয়ের খোঁজে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সে রাস্তা ধরে যেতে যেতে উচ্চস্বরে কাঁদে। এক সহৃদয় ব্যক্তি তাকে নিয়ে যায় নিজের বাড়িতে। মেয়েটার সঙ্গে কয়েকদিন পর তার বিবাহও হয়। কিন্তু লোকটির অপব পত্নীর এতে খুব দুঃখ হয়। সে নতুন বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে। অবশেষে স্বামীর কথায় উভয়েই শান্ত হয়।

নতুন বৌয়ের আগের স্বামী কিন্তু তার ভুল হাটে গিয়েই বুঝতে পারে। ছুটতে ছুটতে চলে আসে বাড়িতে। কিন্তু তাকে বাড়িতে পায় না। তখন সেও প্রতিজ্ঞা করে যে যতদিন পর্যন্ত সে তার পত্নীকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত বাড়ি ফিরবে না।

বারো বছর পর সে তার পত্নীকে দেখতে পায়। বৌ যাচ্ছিল কোমরে কলসী করে জল আনতে। উভয়েই উভয়কে চিনতে পারে।

তারপর দুজনের কথাও হয়। তার বিবাহ বিচ্ছিনা পত্নী তার সঙ্গে যেতে চায়। লোকটা গিয়ে তার নতুন স্বামীর কাছে সমস্ত কথা বলে তার মনোভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু লোকটা তার ঔরসে জাত পুত্র দুটোকে দিতে নারাজ। কিন্তু বৌ ও তার আগের স্বামী ছেলেদুটোকেও চায়। শেষ পর্যন্ত গাঁয়ের মোড়ল আসে বিচার করতে।

মোড়ল মহিলাটির আগের স্বামীকে বক্তব্য রাখতে নির্দেশ দেন।

আগের স্বামী ঃ মোড়ল আমার চালের কুমড়ো ও চালেতে যায়
বিচার করতো কুমড়ো কে বা পায়?
কত রকম ঘোরে বেড়ে লাগালাম গাছ যত্ন করে
তারপরে এক বাহান ধরে ওরই চালে যায়
বিচার করতো .... কে বা পায়?
এরপর মোড়ল মহিলাটিকে মতামত দিতে নির্দেশ দেয়।

স্ত্রী ঃ মণ্ডল আমার জমি হয় আমার কৃষ্ণাণী
অন্যের বিছন কে পায় ফসলখানি?
পতিত জমি ছিল পড়ে এই কৃষাণে আবাদ করে
আমি সত্য কথা দিলাম বলে
এই নিয়ে হয় টানাটানি।

এরপর পরের স্বামীটি মোড়লের নির্দেশে বক্তব্য হাজির করে —

রাস্তায় পড়্যা প্যায়া কৌটাখানি
তাতে থুইলাম দুইলাল পারো কিনা?
যেতে ছিলাম রাস্তা ধরে খালি কৌটা ছিল পড়ে
তাতে দুইলাল দিলাম ভরে
তাই নিয়ে হয় টানাটানি।

মোড়ল তিনজনেরই বক্তব্য শুনে বারো বছরের ভোগ দখলের সত্ত্বানুসারে ছেলেদুটিকে পরের স্বামীকে দিয়ে দেবার নির্দেশ প্রদান করে। আগের স্বামী তার হারানো বৌকে পেয়েই খুশি হয়। তারা নিজের দেশে ফিরে গিয়ে সুখে সংসার নির্বাহ করতে থাকে।

(৬)

কাঠুরিয়ার আলকাপ

কাঠুরিয়া ও তার স্ত্রীর প্রবেশ (কাঠুরিযা অসুস্থ থাকায় তিনদিন অনাহারে কাল কাটানোর পর ক্ষুধায় কাতর স্ত্রী স্বামীকে বলছে)।

স্ত্রী ঃ ওগো শুনছ।

কাঠুরিয়া ঃ (আসরে বসিযা থাকিয়া) কি হৈল, ডাকাডাকি কেনে করছিস?

স্ত্রী ঃ ওগো আজ তিনদিন থাইক্যা কিছুই খাইতে পাইনি। ক্ষুধায় আমার পরান অতি কষ্টে হিয়্যা গেছে। অনাহারে আমি যে আর থাকতে পারছি না, স্বামী।

কাঠুরিয়া ঃ আইজ তিনদিন আমি অসুস্থ। বনে যায়্যা কাঠ কাইট্যা আনা আমার ক্ষ্যামতায় নাই। থাকলে কি তোকে কুনুদিন অনাহারে খুতুম (রাখিতাম)?

স্ত্রী ঃ স্বামী আমি যে আর থাকতে পারছি না। ঘরে কিছু নেই, আমি যুদি এ্যাখন খেতে পাই তাহিলে (তাহলে) আর বাঁচব না।

স্ত্রীর গান ঃ ওগো স্বামী ক্ষুধার জ্বালাই
মরিগো প্রাণে কি।।
আজ তিনদিন হৈল আরে
অনাহারে গ্যাল।
স্বামী অন্ন বিনে
কি ওগো ক্ষুধার জ্বালাই
মরিগো প্রাণে কি।।

স্বামীর গান ঃ কি ওগো প্রিয়ে।

তোমার শোকে ঝরে দু-নয়ন।

বিধাতারি লিখন রে

একি লিখেছিল

কত সইব জ্বালাতন

কি ওগো প্রিয়ে।

তোমার শোকে ঝরে

দুনয়ন।

আমি আমার স্ত্রীর চোখে পানি দেখ্যা আর থাকতে পারছি ন্যা। কপালে যা থাকে জঙ্গলে যায়্যা কাট কাইট্যা হাটে ঘাটে বিক্রি কৈর‍্যা চাইল ডাইল কিন্যা আনব।

(কাঠুরিয়া কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া)

কাট কাইট্যা যা দাম পাইয়্যাছি তাই দিয়া এই চাইল আনুন। (স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া) এই থাকল তোর চাইল-ডাইল। সিদ্ধ, আধা সিদ্ধ যা হয় শীঘ্র কৈর‍্যা রান্ধ্যা য়্যোর কর। মুখ আণ্ধারী (সন্ধ্যা) হৈতে আর বেশি দেরি নাই।

স্ত্রী ঃ আচ্ছা একটুকুন দেরি কোরব না। রান্ধ্যা হইলে দুজনা মিল্যা খাওয়া দাওয়া কৈর‍্যা নিন্দা যাব।

(কাঠুরিয়া ও তার স্ত্রী বসিয়া পড়িল)

(দেশের রাজার শিকারে যাওয়ার জন্য কোটালের সঙ্গে আলোচনা)

রাজা ঃ কোটাল কোটাল।

কোটাল ঃ রাজা কেন ডাকিতেছেন?

রাজা ঃ আইজ বহুদিন হইতে আমার শিকারে যাব্যার বাসনা হইয়্যাছে।

কোটাল ঃ শিকারে যাবেন? সেতো খুবি ভালো কথা। তাহিলে বর্শা বন্দুক নিয়্যা হাতি ঘোড়া সাজাতে কইব কি?

বাজা ঃ লোকজন, লয়-লস্কর, হাতি-ঘোড়া কিছু সোঁতে লিবো না। খালি সোঁতে যাইতে হৈবে তোকে।

কোটাল ঃ রাজা মশাই কবে শিকারে বাহির হৈবেন?

রাজার গান ঃ

ওগো কোটাল শোননা
শিক্যারে যাব্যার হৈয়্যাছে বাসনা
অতি শীঘ্রই ফিরব
কোটাল বেশি দেরি কোরব না।
শিকারে যাব্যার হৈয়্যাছে বাসনা।।

কোটাল ঃ চলেন রাজা, যখন আপনার শিক্যারে যাব্যার এ্যাতো বাসনা হৈয়্যাছে তখন চলেন, এখনি হাঁটা দি।

রাজা ঃ বেশ চল।

(উভয়ে এদিক ওদিক কিছুক্ষণ পদচারণা করিয়া)

রাজা কোটাল গোটা দিনতো বনে বনে ঘুর্‌্যা ঘুর্‌্যা কাটিয়া দিনু, এখন এই জঙ্গলে রাত্রিবাস করব কুনঠে (কোথায়)?

কোটাল ঃ তাইতো রাজা, রাত্রিবাসের জন্য তো একটা আশ্রয় দেখা দরকার। রাইত খানটা তো কুনু রকমে কাটাইতে হৈবে।

রাজা ঃ ঐ যে জঙ্গলে দূরে একটা আলো দেখা যাইচে, ঐখ্যানে চলনা যায়্যা দেখি। ঐ খ্যানে নিশ্চয় কুনু লোকের বাস আছে।

কোটাল ঃ হ্যা বাজা মশায় ঠিক কথায় কৈহ্যাছেন। ভোমও (ক্ষুধাও) তো খুব লাগ্যাছে যুদি কিছু খাইতে পাওয়া যাইত ভালই হইত।

রাজা ঃ হ্যা চল। (কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া) এইত কোটাল চৈল্যা আইস্যাছি। বাইর থাইক্যা ডাকা ফ্যাল।

কোটাল ঃ ঠিক কথা রাজা মশায়, তাহিলে ডাক দি ক্যামন। বাড়তে কে আছ। ভাই এ্যাকটু বাহির কড়ে (দিকে) আইস তো। হামরা বিদ্যাশি, বিপদে পইড়্যা আইস্যাছি।

কাঠুরিয়া ঃ দ্যাখতো ঘরের বাহিরে কে যেন ডাকাডাকি কোরছে।

স্ত্রী ঃ (ঘরের ভিতর হইতেই উত্তর দিল) বাহিরে কে ডাকতিছ?

কোটাল ঃ হামরা দুজন বিদ্যাশি আছি গো।

স্ত্রী ঃ (বাহিরে আসিয়া) কে, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

কোটাল ঃ (রাজাকে দেখাইয়া) এই যে পাঞ্জবে দেখছ, ই হৈলো এ দ্যাশের রাজা। একে হাত জুড়ো সবি অরি মুল্লুক। আর হামি হৈনু রাজার কোটাল। হামরা দুজনা শিকার কোরতে জঙ্গলে আইস্যাছিনু। এখন জঙ্গলে কুনুরকমে থাকতে হৈবে কৈহ্যা তোমার বাড়ি আইস্যাছি। তোমার বাড়ির মানুষটাকে (স্বামী অর্থে) কহ।

স্ত্রী ঃ হাঁর বাড়ির মানুষের শরীল নরম হৈয়্যাছে। তোমরা বৈসা। তোমার যে শুতার সব ব্যবস্থা কৈর‍্যা দিচ্ছি।

কাঠুরিয়া ঃ তোর ভাত হৈয়া থাকলে এখনি খাইতে দে।

স্ত্রী ঃ আইজ কয়দিন থাইক্যা হামরা উপবাসি আছি। যদি কুনু রকমে আইজ সামান্য ব্যবস্থা হৈয়্যাছে তো বাড়তে মোসাফির আইস্যাছে, এখন কি করি?

কাঠুরিয়া ঃ দ্যাখ হ্যামরা না খাইয়া যখন এ কয়দ্দিন কাটিয়া দিনু তখন আর একটা রাইত না খাইয়া কাটিয়া দিতে পারব। যা আছে মোসাফিরকে আনিয়া দে। যুদি অব যে খ্যাইয়্যা দায়্যা বাঁচে তাহিলে হাঁরা বাইট্যা-চুর‍্যা দুলালা মুখে দিব। নাতো এক গিল্যাস কৈর‍্যা পানি খাইয়্যা রাইত কুনুরকমে গুজর‍্যা দিব।

স্ত্রী ঃ বেশ তাই হৌক।

কাঠুরিয়া ঃ খাবার তো আল্লা দিলে কুনুরকমে দিয়্যা চালিয়া দিনু। এখন এই গরীব খানাতে রাজাকে শুনতে দিব কুষ্টে কৈর‍্যা?

রাজা ঃ কাঠুরিয়া, কিছু ভাবা-চিন্তা কোরতে হৈবে না। হামরা তো কুটুমতালি কোরতে আসিনি। বিপদে পৈড়্যা রাহত খান কুনুরকমে কাটাইতে আইস্যাছি। যেখানে হয় এক জাগাতে পৈড়্যা থাইক্যা হাব।

কোটাল ঃ তাই কথা নাতে কি, হামি চালির তলখানিটাতে শুবি, আর রাজা আপনি দরজার পাজরে শুতেন। আর কাঠুরিয়া আর কাঠুরিয়ার বহু ঘরের ভিতরে শুতক।

কাঠুরিয়া ঃ ঠিক অমনি কৈর‍্যা শুতলি কুনুরকমে রাইত খানটা কাটিয়া দিতে পারলি হৈল।

(সকলের শয়ন ও সাটির‍্যা (নবজাতকের যে ভাগ্যলিপি লেখে) পুরুষের আগমন।)

সাটির‍্যা ঃ (রাজাকে দরজায় শুইয়া থাকিতে দেখিয়া) কে দরজাতে শুত্যা আছে? ঘাটা (রাস্তা) ছাড়ো, আমি ঘরে ঢুকব।

রাজা ঃ তুমি কে? এ্যাতো রাতে কেনে তুমি ঘরে ঢুকব্যা?

সাটিব্যা ঃ তোমাব সোঁতে কথা কইব্যার সময় নাই। জলদি কৈব্যা ঘাঁটা ছাড়, আমার ম্যালায় কাজ আছে।

রাজা ঃ না তুমি কেনে ঘরে যাইছ, না কহিলে ঘাটা ছাড়ব না।

সাটিব্যা ঃ কহিছি তো সভারি সোঁতে কথা কহিব্যার সময় নাই।

রাজা ঃ না থাকিলে ঘাটা ছাড়ছিন্যা। যাইতে হয় তো হাঁকে ডিঙ্গিয়্যা যাও। ঘাঁটা ছাড়ব না।

সাটির‍্যা ঃ হামি হিনু সাটির‍্যা পুরুষ, ঘবের ভিতর কাঠুরিয়ার বহু (বউ) গায়ে ভারি আছে। অর প্যাটে যে ছাইল্যা আছে অর কপালে আইজ বিধিলিপি লেখ্যা দিব।

রাজা ঃ তবে আর একটা কথা আছে, এই ছাইল্যার কপালে যে বিধিলিপি লেখব্যা তা হাঁকে কৈহা যাইতে হৈবে।

সাটির‍্যা ঃ হামার কথা কাটাকাটি কৈবব্যার সময় নাই। ঠিক আছে, যা যা বিধিলিপি লেখব তোমাকে কৈহ্যা দিয়্যা যাব।

(সাটির‍্যা পুরুষের পথ ছাড়িয়া দিলে সে ভিতরে ঢুকিল ও পরে ফিরিয়া আসিল।)

সাটির‍্যা ঃ কই ফের ঘাঁটা ঘেরা শুত্যা আছ? জলদি কইর‍্যা ঘাঁটা থাইক্যা হইট্যা খারো। হও।

রাজা ঃ ছাইল্যার কপালে কি লেখল্যো হাকে কৈহ্যা যাও।

সাটির‍্যা   কার ভাগ্যে হাঁরা কি লেখি তা কাহুকি কৈহিব্যার হুকুম নাই।

রাজা ঃ   তাহিলে হামি ঘাটা ছইড়্যা শুতবোনা, যাইতে হয় হাকে ড্যাঙ্গিয়া (ডিঙ্গিয়া) যাও।

সাটির‍্যা   বাহাবারে, ইাঁত আচ্ছা হুজ্জুত্যা লোকের পাল্লাতে পড়নু। হামরা হেন সাটির‍্যা পুরুষ, হামরা কাহুকি ড্যাঙ্গিয়াই পার হৈন্যা।

রাজা ঃ   হামাকে না কহিলে হামি ঘাটাও ছাড়ছিন্যা।

সাটির‍্যা ঃ   যখন ছাইড়ব্যা নাই তখন শুন, এ্যাব কপালে লেখুন যে, যে ছাইল্যাটা কাঠুরিয়ার প্যাটে আছে উ এ দ্যাশের রাজা হত্যা করবে।

রাজা ঃ   একি কথা সাটির‍্যা পুরুষ। তুমি হামার সোঁতে তামাশা করছ?

সাটির‍্যা ঃ   তামাশা? হামরা কুনুদিন তামাশা করিন্যা, যা লিখুন ঠিক সে কথায় কহছি যে, এই ছাইল্যা এ দ্যাশের রাজা হত্যা কোরবে।

(সাটির‍্যা পুরুষ গমন করিলে কোটালকে ডাক দিয়া।)

রাজা ঃ   . কোটাল, কোটাল।

কোটাল ঃ   জি, হুজুর আমায় ডাকছেন?

রাজা ঃ   জলদি শুন এখনি কাঠুরিয়্যা আর কাঠুরিয়ার বহুকে বান্দ।

কোটাল ঃ   এ্যারা কি এমন অপরাধ করলে যে, এ্যারাকে হাতে পায়ে বান্দে হৈবে।

বাজা ঃ   কেনে তা শুনতে হৈবে না। হামার হুকুম তুই অরা দুজনাকে বান্দ।

কোটাল ঃ   হুজুর এ্যারা নিজে না খাইয়্যা হামরাকে খাইতে দিয়্যাছে, রাইতে

খাতির কৈর‍্যা শুইতে দিয়্যাছে, আর তারাকে বান্দাতে কহিছেন?

রাজা ঃ উসব কথা শুনিতে চাহিনা, আগে দু'জনাকে দড়ি দিয়া বান্দ।

কোটাল ঃ বেশ, যা হুকুম করেন তাই কোরছি। হামি তো হৈনু হুকুমের দাস।

(কোটাল কাঠুরিয়ার হস্ত বন্ধন করিল)

কাঠুরিয়ার গান ঃ

বিনা অপরাধে রাজন গো
হস্তে বন্ধন কেন।।
হস্তের বন্ধন দেন খসাইয়া রাজন
পরান আমার বিদরে।
বিনা অপরাধে বাজন গো
হস্তে বন্ধন কেন।।

রাজা ঃ উসব কোন্দন দেখলে চলবে না। এ্যাকে ঐ গাছের সোঁতে আঠে (শক্ত করিয়া) কাঠি বান্দ্যা অর বহুকে বান্দ।

(কাঠুরিয়ার স্ত্রীকে বন্ধন করিলে কাঠুরিয়ার স্ত্রী গান ধরিল)।

চরণ ধরি করি নিবেদন
কি রাজন
চরণ ধরি করি নিবেদন।
আজ রাতে আশ্রয় নিয়ে
কি দোষ পাইয়ে

হস্তে করিলেন বন্ধন।

চরণ ধরে করি নিবেদন

কি রাজন।।

রাজা ঃ কোটাল কান্থকি কান্দন দেখলে চলবে না। কাঠুরিয়া এ গাছের সোঁতে বান্দা থাইক। আর বহুকে বাইন্দ্যা লিয়্যা যায়া কাবাগারে বন্দী কৈর‍্যা থুইয়া দিব। চল, এখন হাঁটা দে।

(কাঠুরিযার স্ত্রীর হস্ত বাঁধিয়া কোটাল ও রাজা যাত্রা করিল এবং কাঠুরিয়া গাছে বাঁধা থাকিল। কাঠুরিয়া বন্ধনমুক্ত হইব্যার চেষ্টা করিয়া ছুটিতে না পারিয়া আপন মনে গান ধরিল।)

আছো গো ধর্ম কোথায়

আছো গো

অসময়ে গড়িয়া ডাকি

তরানের আমারে গো।।

(গান শুনিয়া ধর্মের আগমন)

ধর্ম ঃ এ মোর জঙ্গলে কে আমায় স্মরণ করিতেছিস?

কাঠুরিয়া ঃ আমি এক অধম কাঠুরিয়া। মহা বিপদে পড়িয়া তোমাকে ডাকিতেছি! আমার এই দুই হস্ত এই গাছের সোঁতে বান্দা আছে। আমাকে দয়া করিয়া এই হাত দুইখানি খসিয়া দেন।

ধর্ম ঃ সামান্য এই কাজ, আছা খসিয়ে দিচ্ছি।

(ধর্ম কাঠুরিয়ার হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিলে কাঠুরিয়া যে পথে রাজা আর কোটাল তার স্ত্রীকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়েছিল সেই পথে যাত্রা করিল।)

রাজা ঃ কোটাল এখন শলামর্শ দেখি কৈর‍্যা এই কাঠুরিয়্যার বহুকে (বৌকে) হত্যা কোরতে হৈবে। কে যে সাটির‍্যা পুরুষ কৈহ্যা গেছে যে এ্যার গর্ভে যে ছাইল্যা জন্মিবে সে হামাকে হত্যা করবে।

কোটাল ঃ কি, এ্যাতো বড় কথা, আপনাকে হত্যা কোরবে?

এ্যাক কাজ কোরলে তার ব্যবস্থা আপনা-আপনি হৈবে।

রাজা ঃ কি ব্যবস্থা?

কোটাল ঃ কাঠুরিয়ার বহুকে তো বন্দী কৈর‍্যা থুইয়্যাছি। তাকে যুদি ভাতের সোঁতে বিষ মিশ্যাল কৈর‍্যা দ্যাওয়া যায় তাহিলে উ মৈর‍্যা যাইবে সোঁতে ছাইল্যাও মৈর‍্যা যাইবে।

রাজা ঃ হ্যাঁ ঠিক কথায় কৈহ্যাছিস কোটাল। এখনতো বন্দীই আছে; একদিন সময় বুঝা তার থালাতে বিষ দিয়্যা দিলিই হৈবে। এখন একটা লোককে অকে যোগান দিব্যার লাইগ্যা পাহারা দিয়্যা থুইয্যা দেগা যা।

কোটাল ঃ আচ্চা হুজুর, হামি তাহলে একটা লোক ঢুড্যা আনি।

রাজা ঃ হ্যা, যা।

(কাঠুরিয়া বন্ধনমুক্ত হইয়া বেশ পরিবর্তন করিয়া রাজার বাড়িতে আগমন করিল।)

কাঠুরিয়া ঃ (কোটালকে উদ্দেশ্য করিয়া) হামাকে চারটা কিছু খাবার দাও ভাই। হামি আইজ কয়দিন থাইক্যা কিছুই দানাপানি খাইতে পানি।

কোটাল ঃ তা হামি কি করব? খাইট্যা খাইতে পারিস ন্যা?

কাঠুরিয়া ঃ খাটব কুঠে? কেহ তো খাটতে ডাকে না বাবা।

কোটাল ঃ বেশ, হামি তোকে একটা কাজ দিব। কিন্তু সে কাজ খুব বিশ্বাসের সোঁতে কোরতে হইবে।

কাঠুরিয়া ঃ দ্যাখেন তো ভালো, এট্যা কুনু কথা, হুজুরের কাজ বিশ্বাসের সোঁতে কোরবনা কেন।

কোটাল ঃ কাজটা কিছুই লয়। খালি একটা বন্দীকে যোগান দিতে হৈবে।

কাঠুরিয়া ঃ হ্যাঁ খুব পারব। যামন কৈর‍্যা যোগান দিতে কহিবেন ঠিক ত্যামন কৈর‍্যা যোগান দিব।

কোটাল ঃ বেশ এই যে বন্দীশালা আছে। এই বন্দীশালার দরজার ভিতরে যে মাইয়্যা লোকটার দেখছিস, যোগান দিতে হইবে যাতে উ কুনুরকমে গালিয়্যা যাইতে না পারে। আর অকে দু ব্যালা খাবার দিতে হইবে।

কাঠুরিযা ঃ ঠিক আছে, হামি তাই কোরব। এখন থাকাই যোগান দিতে লাগুন।

(কোটাল চলিয়া গেলে)

এই দেখছিস, আর কান্দিস ন্যা হামি আস্যাছি।

কাঠুরিয়ার স্ত্রী ঃ এ্যা, তুমি আইস্যাছো? হাঁকে তুমি যামন কৈর‍্যা হৈক বাঁচাও।

কাঠুরিয়া ঃ তার লাগাইতো আইস্যাছি।

(এমন সময় খাবারে বিষ মিশায়ে চাকরের খাবার লইয়া আগমন।)

চাকর ঃ এই যে খাবাব। এই খাবার তুমি দরজার ফাঁক দিয়্যা ভিতরে দিয়্যা দাও। হামি এখ্যান কৈর‍্যা বুসনু।

কাঠুরিয়া ঃ (স্বাগত) খাবার তো খাইতে দিব কিন্তু ক্যামন কৈর‍্যা বুঝব এই খাবারের সোঁতে বিষ দিয়্যাছে কিনা। এই তো একটা বিড়াল অকি আগে খাইতে দি। সর্বনাশ, বিলাই (বিড়াল) মৈর‍্যা গ্যালো, তখন এতো খুব বিষাক্ত বিষ আছে। আচ্ছা ভোগা (ফাঁক) দিয়্যা গিল্যাসের পানি ফুটিকে ফেল্যা দিয়্যা ফের অকে আনতে কহি আর ফাঁক তালে ভাত কয়ট্যা উল্টিয়া ফেল্যা কহবো যে খাবার খাওয়া শ্যাষ হৈয়্যা গেছে।

(পানি উল্টিয়া) এই এই ভাই পানি তো হাতে বারি লাইগ্যা পৈড়্যা গ্যালো। আরাক গিল্যাস পানি আন তো।

(চাকর পানি লইয়া আসিয়া)

চাকব ঃ আরে ভাত কি হৈল?

কাঠুরিয়া ঃ মাইয়্যা লোকটাকে খুব ভোখ লাইগ্যা ছিল। ভিতরে খাবার দিতেই দুলু কমাতেই শ্যাষ কৈর‍্যা দিয়্যাছে।

চাকর ঃ বেশ ভালুই হৈলো। চটভট খাওয়া হওয়াতে হাঁকে আর লিপিভ্যা হৈয়্যা বৈশ থাকতে হৈল না।

রাজা ঃ কোটাল, কোটাল।

কোটাল ঃ জি হুজুর হাঁকে কেনে ডাকছেন?

রাজা ঃ কি কাজেব কতদূর হৈল?

কোটাল ঃ হ্যাঁ হুজুর সব ফায়সালা কৈর‍্যা দিয়্যাছি।

রাজা ঃ বেশ বেশ, হামি খুব লিচিন হৈনু। কাইল শঁহাতে তুই যায়্যা অর মরা লাশ নদীতে লিয়্যা যায়্যা ভাসিয়া দিস।

কোটাল ঃ আচ্ছা হুজুর, (এদিক ওদিক তাকিয়ে)

কোটাল ঃ কে কুণ্ঠে আছিস, আয় তো একটা মরা লাশ ফেল্যা দিয়্যা আসিশ্যা।

চাকর ঃ কার লাশ ফেলব্যা।

কোটাল ঃ কাঠুরিযার বহুর লাশ। যাকে বন্দী থুইয়্যাছি।

চাকর ঃ কে মইর‍্যাছে, দ্যাখেন না রাইতে অর এ্যাকটা ব্যাটা ছাইল্যা হৈয়্যাছে।

কোটাল ঃ কি কইলি ব্যাটা ছাইল্যা হৈয়্যাছে? ইরি কৈর‍্যাছি। রাজা, রাজা রাজা মশায়।

রাজা ঃ কি হৈয়্যাছে কোটাল? এ্যাতো ঢাকাঢাকি কেনে?

কোটাল ঃ কাম হৈয়্যা গেছে। আপনি রাজ্য পাট ছাইড়্যা দিয়্যা দেশান্তরী হৈয়্যা যান। তা না হৈলে আপনার বাঁচন নাই।

রাজা ঃ কি হৈয়্যাছে কোটাল, তুই এ্যামন কথা কহছিস কেনে।

কোটাল ঃ ব্যাপার খুব খারাপ। কাইল রাইতে ঐ কাঠুরিয়ার বহু এ্যাকটা ছাইল্যা বিয়ালছে, ব্যাটা ছাইল্যা।

রাজা ঃ সত্যি বলিছিস কোটাল?

কোটাল ঃ সত্যি মানে এক্কেবারে খাঁটি কথা।

রাজা ঃ তাহিলে কি উপায় হৈবে কোটাল?

কোটাল ঃ কি হৈবে, আপনাকে তো কহিছি রাজপাঠ ছাইড়্যা দে পালান।

রাজা ঃ না না কোটাল, হামি তামাশা নয়। কি উপায় কোরব সে কথা তুই যা বলিবি তাই দিব।

কোটাল ঃ এই তো রাজা কিছু ভাববেন না। এ্যাখন কথা হৈল্যো যে দুধের ছাইল্যাকে তো মারা যাইবে না। তাকে এ্যাকটা হাঁড়িতে কৈর‍্যা

ভাঁসিয়্যা দিতে হৈবা। তখন অকে মাছ কুমীরে সব কিছু মিল্যা খাইয়া সাবাড় কৈর্য়া দিবে।

রাজা ঃ ঠিক কথা কোটাল, চল এখনি ছাইল্যা কর‍্যো ভাসিয়া দিগ্যা।

কোটাল ঃ আইস্যেন এই যে কাঠুরিয়ার বহু ছাইল্যা কোলে কৈড়্যা আছে। এই এই ছাইল্যা দে।

কাঠুরিয়ার স্ত্রী ঃ না না ছাইল্যা দিব না। তোমরা আমার ছাইল্যা লিও না।

রাজা ঃ অর কুনু কথা শুনতে হৈবে না।

স্ত্রীর গান ঃ

ওগো রাজন ধরি চরণে।
ছেলে নিবেন ক্যামনে।
ওগো রাজন ধরি চরণে
দুধের শিশু ছেড়ে আমি
থাকি কোমনে।।

কোটাল ঃ লে চুপ, তোর প্যান প্যানানি শুনতে চাহিন্যা। (ছেলেকে জোর করে কাড়িয়া) রাজা মশায় এই হাঁড়িতে ভরিয়া নদীতে ভাসিয়া দিনু।

রাজা ঃ যাক এখন নিচিত হৈনু।

কাঠুরিয়া ঃ (স্বগত) হামি এখন কাজে ছুটি লিয়্যা এই ছাইল্যাকে ধৈরব্যার লাইগ্যা যাত্রা কোরব। (রাজাকে উদ্দেশ্য করিয়া) রাজা রাজা, হামি আর আপনার এখ্যানে চাকরি কোরব না। হামাকে ছুটি দেন।

রাজা ঃ বেশ ছুটি যখন লিবি তখন যা। কিন্তু শীঘ্রি ফির‍্যা আসিস।

(জেলের জালে ছেলে ধরা পড়িলে।)

কাঠুরিয়া ঃ জাইল্যা ভাই, এই ছাইল্যা হামার, হামার ছাইল্যা হাঁকে ফ্যারত দাও।

জেলে ঃ বারে আমি নদীতে জালে ছাইল্যা পাইয়াছি। এ ছাইল্যা তোকে দিব না।

কাঠুরিয়ার গান ঃ

না না না ও জেলে ভাই
ছেলে দেন আমারে
শুনেন বলি ও জেলে ভাই
ছেলে দেন আমারে।।
ব্যবিচারি রাজ্যের রাজা গো
ছেলে নিল কেড়ে।
শুনেন বলি ও জেলে ভাই
ছেলে দেন আমারে।

জেলে ঃ না ছাইল্যা কার না কার তোকে এই ছাইল্যা হামি দিব না। এ ছাইল্যাকে হামি এ রাজ্যের রাজাকে দিব। (এই বলিয়া সে দেশের রাজার নিকট হাজির হইয়া) রাজা মশায়, এই ছাইল্যাকে নদীতে হাঁড়ির মধ্যে পাইয়্যাছি।

রাজা ঃ কই ছাইল্যা দেখি।

জেলে ঃ এই যে রাজা।

রাজা ঃ আহা আহা সোনার চান্দের মতন ছাইল্যা। এই ছাইল্যাকে হামি মানুষ করব। রাণীর তো কুনু ছাইল্যা পিল্যা নাই। ছাইল্যা পাইলে খুব খুশি হৈবে, এই ছাইল্যার নাম থুইনু 'সাগর ভাসা'।

কাঠুরিয়া ঃ (স্বগত) ছাইল্যাকে কে তো রাজা লিয়্যা লিলে, এখন হামি আর ছাইল্যাকে লিয়া যায়।) কি কোরব বরং হামি রাজার কাছে চাকরি লিয়্যা এখ্যানে থাইক্যা যায়। ছাইল্যাটাকে তো চোখের সামনে সব সময় দেখতে পাবু। (রাজাকে - রাজা মশায়, আমি এ্যাক বিদ্যাশি, দ্যাশে খুব আকাল পড়াতে আপনার রাজ্যে কাজ কামের আশাতে আইস্যাছি। হামাকে যা হয় আপনার বাড়িতে চাকরি দেন।

রাজা ঃ কি আর চাকবি দিব। আচ্ছা আমি যে ছেলেটিকে পাইয়্যাছি সে ছাইল্যাকে দেখাশুনোর ভার তোর উপরে থাকল।

[বিরতির পর]

রাজা ঃ আমি সাগর ভাসাকে যথারীতি স্কুলে পড়াশুনাও কোরতে দিয়েছি আর ছেলেটিও পড়াশুনায় খুব ভালো। যাকে কহে মাথায় খুব তেজ। এই যে আমার সাগর-ভাসা বই-পত্র লিয়্যা স্কুল থাইক্যা পড়াশুনা কৈর‍্যা আসছে।

একি বাবা, তোমার মুখ ভার ক্যান? কথা বল, কি হইয়াছে? কেও কি কিছু বল্যাছে?

সাগর ভাসা ঃ হ্যা বাবা আমাকে স্কুলের ছেলেরা যাতা কৈহ্যা গালাগালি কৈর‍্যাছে।

রাজা ঃ কি যাতা কৈহ্যা গালি দিয়াছে বাবা?

সাগর ভাসা ঃ তাবা আমাকে জাবজ সন্তান কৈহ্যা গালাগালি দিয়াছে।

রাজা ঃ হ্যাঁ, এ্যাতো বড় সাহস, কে তোমাকে গালি দিয়াছে জারজ সন্তান কৈহ্যা?

সাগর ভাসা ঃ হ্যাঁ বাবা, আমাকে জাবজ সন্তান কৈহ্যা গালি দিয়াছে।

আমি এ্যাখন জানতে চাই আমার কে বাপ আর সে বাপ কুণ্ঠে আছে?

রাজা ঃ সে তো আমি জানি না বাবা, তুমি সাগরে ভাইস্যা আইস্যা ছিল্যা। এ্যাক জাইল্যা ধৈর‍্যা দিয়্যা গেছে। আর কুনু খবর তো হামি দিতে পারব না বাবা।

কাঠুরিয়া ঃ রাজা মশায়, অভয় দ্যান তো হামি আপনাকে এ্যাকটা কথা বলি।

রাজা ঃ কি কথা?

কাঠুরিয়া ঃ কি কথা, কথাটা হৈল, এই ছাইল্যা হামার ছাইল্যা আর হামি হৈনু এ্যার বাপ।

রাজা ঃ এ্যা বলিস কি?

কাঠুরিয়া ঃ হ্যোঁ রাজা মশায়, অমুক দ্যাশের অত্যাচারী রাজাকে বাত্রে আশ্রয় দিয়্যা সে এই ছাইল্যা হত্যা কৈরব্যার লাইগ্যা সাগরে ভাসিয়ে দিয়াছিল হামি এ্যার লাইগ্যা পিছে পিছে দৌড়াইয়্যা আপনার রাজ্যে আইস্যা আছি।

রাজা ঃ এ্যাত বড় কথা, এই ছাইল্যাকে দিয়্যাই ঐ রাজাকে ধ্বংস কোরব। আইজ থাইক্যা অস্ত্র-শস্ত্র, ঢাল-তলোয়ার শিখিয়্যা তাকে ওস্তাদ কৈর‍্যা দিব।

কোটাল ঃ রাজা আইজ তো এ্যাক যুগ বার বছর হৈয়্যা গ্যালো কাঠুরিয়ার স্ত্রীকে বন্দী কৈর‍্যা থুইয়্যাছি। এখন ত উ পাগলী হৈয়্যা গেছে, অকে আর বন্দী রাইখ্যা কি হৈবে।

রাজা ঃ আহা ব্যাচারী পুত্রের শোকে পাগলী হৈয়্যা গেছে। আচ্ছা অকে ছাইড়্যা দাও।

কোটাল ঃ পাগলী এ পাগলী, তোর মুক্তি। তুই যেখ্যানে খুশি চৈল্যা যা।

স্ত্রী : হাঃ হাঃ হাঃ আমার মুক্তি মুক্তি।

(কাঠুরিয়ার স্ত্রী দৌড়াইয়া যাইতে থাকিলে তাহার ছেরলর তীর আসিয়া তাহার গায়ে বিদ্ধ হইলেছ)

স্ত্রী : উঃ মাগো।

কাঠুরিয়া : একি একি হৈল, হায় পুত্র তুমি তোমার জননীকে তীর মারিয়াছ, মারিয়াছ?

ছেলে : ওঃ মাঃ মাগো।

গান

হায় রে আমি কি করলাম
না চিনিয়া তীর মারিলাম
আমার তীরে মারা গ্যালো মাগো
অদৃষ্টে কি লিখা ছিল
না ভাবিয়া সবি হৈল
সাথের সাথী কেরা্যা লাও না মাগো।

(বিবেকের আগমন ও গান)

কান্দিস না ওরে পাগল
এই যে আমি এসেছি রে
কান্দিস না ওরে পাগল।
ওগো ভগবান তো আছে সহায়
কেবা তোকে মারতে পারে।।

(বিবেক পিতা-পুত্রকে উল্টো মুখ করিয়া খাড়া করাইয়া ছেলের মাকে জীবন দান করিল।)

সাগর ভাসা ঃ মা মাগো

কাঠুরিয়ার স্ত্রী ঃ এ্যাঁ তুই আমার ছেলে, তুই বাইচ্যা আছিস? ও খোদা।

সাগর ভাসা ঃ (রাজাকে উদ্দেশ্য করিয়া) বাবা আপনি আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। এখন আমি আমার মা, বাবা ফ্যারত পাইয়াছি। আমি এ্যান প্রতিশোধ নিতে চাই বাবা।

রাজা ঃ খুব ভালো বাবা, আমি আশীর্বাদ করি তোমার মনের বাসনা যেন পূর্ণ হয়। আমার লয়-লস্কব সৈন্য সব নিয়া যাও।

(সকলের হৈ হৈ করিয়া গমন ও রাজার সাক্ষাৎ লাভ)

সাগর ভাসা ঃ রাজা, আমার পিতা-মাতার অত্যাচারের প্রতিশোধ লিতে আইস্যাছি। হয় নিজে লড়েন, না হয় সৈন্য দিয়্যা লড়াই হৈবা।

রাজা ঃ হাঃ হাঃ হাঃ! তুই হোলি সামান্য বালক, তুই আমার সোঁতে লড়াই কোরবি? এ্যাতো বড় ক্ষ্যামতা?

সাগর ভাসা ঃ মুখের কথা চাহিন্যা গায়ে বল থাকে ময়দানে লাইমা আয়।

রাজা ঃ এ্যাঁ এ্যাতো বড় কথা।
(তলোয়ার হাতে লড়াই করিতে আসিয়া ছেলেটির কাছে পরাজয় ও মৃত্যুবরণ।)

বিবেকের গান ঃ

ধর্মের জয় সবাই বলে
অধর্মের জয় হয় নারে।
আমার ওস্তাদ বলে সভাস্থলে
অধর্মে কেও যেওনা রে।।

উৎসপঞ্জি

১. বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার পাকুড় থানার অন্তর্গত ইলামি গ্রামের বাসিন্দা প্রবীণ শিল্পী ওস্তাদ পঙ্কজ ভূষণ দাসের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

২ একই গ্রামের প্রধান শিল্পী হরেরাম সরকারের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৩. মালদহ জেলাব কালিয়াচক থানার অন্তর্গত বাখরপুর গ্রাম নিবাসী এককালের খ্যাতনামা সঙাল প্রধান শিল্পী ওস্তাদ সেখ সিরাজুদ্দিনের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৪ বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার রাজমহল থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর-মিছুটোলা নিবাসী আলকাপ শিল্পী মকবুল খলিফার কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৫. মালদহ জেলার মানিকচক থানার অন্তর্গত রহিমপুর নাকিটোলা গ্রাম নিবাসী ওস্তাদ নিজামুদ্দিন সেখের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৬. রাজশাহী জেলাব নবাবগঞ্জ থেকে লোকনাট্যটি সংগ্রহ করেছেন ঢাকা বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত লোকসাহিত্য সংগ্রাহক জনাব কাজেমউদ্দিন। লোকসাহিত্য সংকলন — ৪১।